

হুমায়ুন আজাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম

সবুজ পাহাড়ের

ভেতর দিয়ে

প্রবাহিত

হিংসার

ঝরনাধারা



এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা উঠলেই সেখানে বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠতো, কিন্তু যাওয়া হতো না; পরে তার কথা উঠলেই ভয়ে গা শিউরে উঠতে থাকে, কেউ সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। আমরা শুনেছি বিদ্রোহ করেছেন উপজাতীয়রা; ওই লাল পাহাড় আর চিরহরিৎ বনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছে পারস্পরিক হিংসাঘৃণাবিদ্বেষের পথকিল ঝরনাধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ'রে আছে পাহাড়ে, তার পাশ দিয়ে বয়ে চলছে ঝরনার পর ঝরনা, যেগুলোকে বলা হয় 'ছড়ি' বা 'ছড়া'। ওই ছড়িগুলো দিয়ে জলের মতোই বয়ে চলছে ঘৃণা আর হিংসা, যাতে কালো হয়ে আছে সবুজ পাহাড়গুলো, তার রাজ্য মাটি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল শাদা মঙ্গোলীয় মানুষের মনে আর নির্মল ঝরনাধারা নেই। তাঁরা স্বাধীনতা চান, নইলে স্বায়ত্তশাসন চান; তাঁরা দাবি করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে, এর থাকবে নিজস্ব আইন পরিষদ; পার্বত্য আদিবাসী জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের শাসন বিধির অনুরূপ সংবিধি থাকতে হবে শাসনতন্ত্রে; থাকবে রাজাদের দণ্ডর; পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে এমন সংবিধি ব্যবস্থা। তাঁদের দাবিগুলো মেনে নেয়া হয় নি, কেননা মেনে নেয়া অসম্ভব; তাই তাঁদের বিদ্রোহ। হুমায়ুন আজাদ এ-ছোটো বইটিতে নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার সমস্যা; বইটি হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাহিত্য- গভীর ও অন্তর্ভেদী, যা পাঠকের চেতনার ভেতরে সঞ্চারিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে।

হুমায়ুন আজাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম

সবুজ পাহাড়ের
ভেতর দিয়ে
প্রবাহিত
হিংসার
ঝরনাধারা



আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৪০৪ : আগস্ট ১৯৯৭

রত্ন হুমায়ুন আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ফোন ২৩১৩৩২, ২৩০০২১

মুদ্রণ বরবর্ষ প্রিন্টার্স ২৭ বি কে দাস রোড ঢাকা

প্রচ্ছদ মানবেন্দ্র সূর

মূল্য ৪০.০০ টাকা

ISBN 984 401 435 2

Parbatya Chantagram : Shabuj Paharer Bhetar Diye

Prabahita Hingshar Jharnadhara :: The Chittagong

Hill Tracts : The Stream of Violence

Flowing Through the Green Hills : Humayun Azad

Published by Osman Gani, Agami Prakashani,

36 Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.

First Published : August 1997.

Price : Tk 40.00

উৎসর্গ

পাহাড়ি মানুষদের-উপজাতীয় ও বাঙালির হাতে,
যারা শুধু হৃদয়ের চুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে শক্তি, যা পারবে না
রাজনীতিকেরা, সেনাপতিরা, বিদ্রোহীরা

অসুস্থ আহত সুন্দর

বাঙলাদেশের এক রূপময় খণ্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম, তিন দশক ধরে অসুস্থ আহত। কী হচ্ছে সেখানে বাঙালি তা ভালো করে জানে না, তাদের জানানও আগ্রহ কম; এবং সরকারগুলোও, এক সময়, পালন করতো সন্দেহজনক নীরবতা। অস্পষ্টভাবে জানতাম আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা চান স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন; এবং তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালির মতো আমিও জানতাম সামান্যই; তবে এক দশক আগে তাঁদের পক্ষে লিখেছিলাম একটি আবেগকাতর রচনা; এবং অনেক অনামা পাহাড়ি পত্রলেখক আমাকে তাঁদের স্বপ্নের জুমল্যাব্দের নাগরিকত্বও দিয়েছিলেন। সম্প্রতি সরকার ও সামরিক বাহিনীর আমন্ত্রণে, আরো বহু বুদ্ধিজীবীর মতো, আমারও সুযোগ ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখার (৯-১১ জুন ১৯৯৭)– দেশে সামরিক শাসন থাকলে আমি এ-আমন্ত্রণ অবহেলা করতাম; আমি যা দেখে প্রথমই মুগ্ধ হই, তা পার্বত্য পাহাড়ি সৌন্দর্য। কিছু না লিখলেও পারতাম আমি, যেমন অনেকেই লেখেন নি; তবে আমার ইচ্ছে হয় লেখার; তার ফল এ-রচনাটি, যা চার সংখ্যায় বেরোয় *বাংলাবাজার পত্রিকায়* (২৪-২৭ জুলাই ১৯৯৭)। খটখটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা নিম্নতীব্রতার বিরোধের তত্ত্ব আমি লিখি নি; গবেষণাগারে বসে তৈরি করি নি অব্যর্থ শাস্তির সূত্র; আমি লিখেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানসাহিত্য। জানতে চেয়েছি আমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে, এবং জানাতে চেয়েছি দেশবাসীকে, যা তারা জানে না, কিন্তু জানা দরকার। পাহাড়িরা চান স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক পরিষদ, এবং আরো অনেক কিছু; তাঁদের চাওয়ার মাত্রা একটু বেশিই; তাঁরা যা চান, তাতে বাঙলাদেশ অক্ষম থাকে না। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী হিশেবে তাঁরা এমন কিছু চাইতে বা পেতে পারেন না, যা রাষ্ট্রের অন্য অংশের মানুষ চাইতে বা পেতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের অভাব নয়; প্রধান সমস্যা হচ্ছে ওই অঞ্চলের সামন্ত প্রভুরা সাধারণ মানুষদের বিকশিত হতে দেয় নি, তাঁদের দাসে পরিণত করে

রেখেছে ১৯০০ সালের বিধিমালা দিয়ে, অঞ্চলটিকে ক'রে রেখেছে ও রাখতে
 চাচ্ছে এক নিষিদ্ধ দেশ, এবং এটা বুঝতেও দেয় নি পাহাড়ের সরল শান্ত
 দরিদ্র মানুষদের। বাংলাদেশের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সমগ্র জনগণের মতোই
 পাহাড়ি জনগণকে আধুনিক গণতান্ত্রিক অধিকারসম্পন্ন সচ্ছল শিক্ষিত মানুষে
 পরিণত করা; এবং তাদের দ্রুত সার্বিক উন্নতি সাধন। তাঁদের আদিম সামন্ত
 সমাজকাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষের কোনো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই;
 তাই ওই সামন্ত সমাজকাঠামো ভাঙা দরকার। শান্তিহীন পৃথিবী এখন অজস্র
 শান্তিচুক্তির ভূপে ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু শান্তির আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না।
 চুক্তিবদ্ধ শান্তি বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার, চুক্তির মধ্যেই থাকে চুক্তিভঙ্গের
 বীজ; আর শান্তির পায়রা ওড়ার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে। শান্তি
 স্থাপনের কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র নেই, এবং এমন কোনো যাদুও নেই যার
 মায়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িতে ও হুদে ঢেউ খেলতে থাকবে শান্তি। পাহাড়িরা
 তাঁদের দাবিগুলোকে গৃহীত ও বাংলাদেশের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে
 চান, যা সংবিধানের মূল চেতনারই বিরোধী। চুক্তি ক'রে নয়, পাহাড়িদের
 অবস্থার উন্নতি ক'রেই শুধু সেখানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব শান্তি। এ-দীর্ঘ
 রচনাটিকে বই আকারে প্রকাশের পরিকল্পনা আমার ছিলো না; কিন্তু অনেকের
 আগ্রহে এটিকে বইরূপ দেয়া হলো। এক দশক আগে প্রকাশিত 'রক্তাক্ত বিপন্ন
 পাহাড়' রচনাটিও সংকলিত হলো; এবং সহজে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জানার
 জন্যে যুক্ত হলো 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : তথ্য' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : কালপঞ্জি'।
 এ-ছোটো বইটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার সমস্যা সম্পর্কে পাঠক পাবেন
 একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, যা উপস্থাপিত হয়েছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে।

২০ শ্রাবণ ১৪০৪ : ৪ আগস্ট ১৯৯৭

হুমায়ূন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম
সবুজ পাহাড়ের
ভেতর দিয়ে
প্রবাহিত
হিংসার ঝরনাধারা

বাংলাদেশ ছোটো, কিন্তু এর একপ্রান্তের মানুষের কাছে সুদূর অপরিচিত
 আরেক প্রান্ত; আজো আমরা প্রায়-মধ্যযুগীয় দূরত্বের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এ-দূরত্ব
 শুধু স্থানিক নয়, মানসিকও। তেঁতুলিয়া পঞ্চগড়ের মানুষ জানে না দিঘিলালা
 বা রাউজান বা রুমা বা সাংগু নদী বা নাইকংছড়ি কেমন; জৈন্তাপুরের মানুষ
 জানে না কেমন চরফেশন বা বরগুনা বা সাতক্ষীরা। আমাদের দেশ ছোটো,
 কিন্তু অধিকাংশের চোখে এটি মহাজগতের মতোই অস্পষ্ট। শুধু দুই প্রান্তের
 মানুষই যে জানে না একে অন্যকে, তাই নয়; পাশাপাশি এলাকার মানুষেরা
 একে অন্যকে জানে না; যেমন চট্টগ্রামের অধিকাংশ মানুষের কোনো ধারণা
 নেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে;— তাদের চোখেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সুদূর
 অস্পষ্ট, এবং তীতিকর, এলাকা। আমিও শুধু জানতাম যে আমাদের দেশের
 দক্ষিণ-পূবে একটি এলাকা আছে, যার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম, যেখানে আছে
 অনেক পাহাড় আর বন আর উপত্যকা আর ঝরনা, যেখানে চাকমা বাস
 করে— অন্য উপজাতীয়দের কথা মনেই থাকে না, পাহাড়ের গায়ে তারা চাষ
 করে, যাকে বলা হয় ‘জুম’, আর সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে তৈরি
 করা হয়েছে এক বিশাল কৃত্রিম হ্রদ—যার সৌন্দর্যের তুলনা নেই বাংলাদেশে।
 এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা উঠলেই সেখানে বেড়াতে যাওয়ার কথা
 উঠতো, কিন্তু যাওয়া হতো না; পরে তার কথা উঠলেই ভয়ে গা শিউরে
 উঠতে থাকে, কেউ সেখানে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। আমরা শুনেছি
 সেখানে চলছে গোলমাল, বিদ্রোহ করেছেন উপজাতীয়রা; বিশেষ করে
 চাকমা। কতো বছর ধরে বিদ্রোহ চলছে? অনেকের মতো আমিও জানতাম
 না যে বিদ্রোহ চলছে চব্বিশ বছর ধরে— ১৯৭৩-এর মাঝামাঝি থেকে; এবং
 জেনে আমিও চমকে উঠি অনেকের মতোই। এতো দিন ধরে চলছে বিদ্রোহ?
 ঢাকায়, দেশের কেন্দ্রে, থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বেশি ভাবার সময়
 আমার হয় নি, যেমন হয় না অধিকাংশের। সরকারগুলোও আমাদের বেশি
 কিছু জানাতে চায় নি, রাখতে চেয়েছে অন্ধকারে। কিছু দিন আগে পার্বত্য
 চট্টগ্রামকে কিছুটা দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে; দেখতে পেয়েছি ওই লাল পাহাড়
 আর চিরহরিৎ বনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছে পারম্পরিক হিংসাঘৃণাবিদ্বেষের
 পথকিল ঝরনাধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভরে আছে পাহাড়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে
 বিছানো পাহাড়ের পর পাহাড়মালা ওই অঞ্চলকে সাজিয়েছে বিষয়কর
 রূপে—যে-বিষয় সহ্য করা কঠিন হৃৎপিণ্ডের পক্ষে, আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে
 বয়ে চলছে ঝরনার পর ঝরনা, যেগুলোকে বলা হয় ‘ছড়ি’ বা ‘ছড়া’। পার্বত্য
 চট্টগ্রামের ওই ছড়িগুলো দিয়ে জলের মতোই বয়ে চলছে ঘৃণা আর হিংসা;

আর ওই ঘৃণা ও হিংসায় কালো হয়ে আছে সবুজ পাহাড়গুলো, তার রাজ্য মাটি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল শাদা মঙ্গোলীয় মানুষের মনে আর নির্মল ঝরনাধারা নেই, তা এখন খুবই মলিন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিলো কাণ্ডাই হ্রদ, তখন উপজাতীয়রা বলেছিলেন, ওই তারের ভেতর দিয়ে শুধু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, তার ভেতর দিয়ে দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসও বয়ে চলে। দুঃখ ও দীর্ঘনিশ্বাসের শক্তি কম, নেই-ই বলা চলে; কিন্তু দুঃখ-দীর্ঘনিশ্বাস একদিন বিস্ফোরকের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। আজ, চব্বিশ বছর ধরে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ছড়ির পর ছড়ি দিয়ে শুধু জল বয় না, বয়ে চলে ঘৃণাবিষের হিংসার ধারা। সেখানে উপজাতীয়রা ঘৃণা করে চলছে বাঙালিদের, আর বাঙালিরাও ঘৃণা করছে উপজাতীয়দের; পারস্পরিক ঘৃণায় ভীষণ অসুস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম। একে অবিলম্বে সুস্থ করে তোলা মানুষ ও দেশের জন্যে খুবই দরকার।

ঘৃণা, হিংসা, ও রক্তপাত বর্ণনার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমি বর্ণনা করতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূবে, আয়তন সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয় নয়, কারো মতে ৫০৯৩ বর্গমাইল, কারো মতে ৫১৩৮ বর্গমাইল বা ১৩০০০ বর্গ কিমি; অর্থাৎ বাংলাদেশের দশ ভাগের একভাগ। একে ভাগ করা হয়েছে তিনটি জেলায় : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, ও বান্দরবান (বন নয়, বনের কথা ভেবে আমরা বান্দরবানকে বান্দরবন বলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি; 'বান্দরবান' বোঝায় 'বানরের বাঁধ')। তিনটি জেলায় থানা আছে ২৫টি : খাগড়াছড়িতে ৮টি (খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মাণিকছড়ি, মহলছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি); রাঙ্গামাটিতে ১০টি (রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, নানিয়ারছড়ি, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাণ্ডাই, রাজস্থলি, বিলাইছড়ি); বান্দরবানে ৭টি (বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, ধানচি, আলিকদম, নাইক্ষ্যছড়ি)। সেখানে পল্লীর নাম করল্যাছড়ি, সোনাইখাম, গোরহান, ভূষণছড়া, শিলছড়ি, পেত্যাছড়ি, তুন্যাছড়ি, বাকছড়ি ধুম আদাম, উগলছড়ি, লাল্যাঘোনা, বাঙ্গামুরা, কাটালতলি, গুলছড়ি, বেতছড়ি মুখ, তৈনদং, শীলবন, ধনপাদা, করল্যাছড়ি, পানছড়ি, বগাপাড়া, আচালংপাড়া প্রভৃতি। এখন সেখানে মুসলমানরা গিয়ে গ্রামের নাম রাখছে পাকিস্তানি ধরনের মোহম্মদপুর। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভেঁরেই আছে পাহাড়পুঞ্জ, উপত্যকা, অরণ্য, আর নদী। পাহাড় আর উপত্যকার মধ্যে আছে সুবলং, সাজেক, কাশালং, মাইরানি, চেংগি, তবলছড়ি, কালাপাহাড়, বন্দুকভাড়া,

হরিণা, গোবাইছড়ি, সীতাপাহাড়, রাইনখং, চিছুক, মৌদক, মিরেঞ্জা। পাহাড়গুলো ১০০ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু; সবচেয়ে উঁচু চুড়োটির নাম কেওক্রাডং। সরকার নাকি এর নাম বদলে রাখতে চাচ্ছে 'বিজয়'; আমি এর পুরোনো নামটিই পছন্দ করি, চিরকাল পুরোনো নামটিই বলবো। নদী ও অরণ্যের মধ্যে আছে মাইয়ানি নদী ও অরণ্য, কাসালং নদী ও অরণ্য, চেংগি নদী, কাঙাইহুদ, ঠেংগা, রাইনখং, সাংগু নদী ও অরণ্য, কর্ণফুলি নদী, মাতামুহুরি নদী ও অরণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের দু-পাশে আছে দুটি দেশের সাথে সীমানা : খাগড়াছড়ির জেলার পশ্চিম পাশে ভারতের ত্রিপুরা- সীমানার পরিমাণ ২৩৭ কিমি; রাঙ্গামাটি জেলার পূর্বপাশে ভারতের মিজোরাম- সীমানার পরিমাণ ১৭৬ কিমি; রাঙ্গামাটির জেলার কিছু অংশ ও সম্পূর্ণ বান্দরবান জেলার পূর্বপাশে আছে মায়ানমারের সাথে ২৮৮ কিমি সীমানা। তবে পূর্ব দিকে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সীমানা যতোটা মূর্ত, তার থেকে অনেক বেশি বিমূর্ত : খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের যেখানে ফেনি নদীর (পাশে সম্ভবত ৩০ ফুট) মাঝখানেই শুরু হয়েছে ভারতের ত্রিপুরা, সেখানে সীমানা চোখে দেখা যায়; কিন্তু মিজোরাম আর মায়ানমারের সঙ্গে সীমানা অনেকটা বিমূর্ত বা কল্পিত, বা আছে শুধু অদৃশ্য স্তম্ভ বা মানচিত্রে। সেখানে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়, একমাইল পথ হেঁটে যেতে যেখানে লাগে কয়েক ঘণ্টা; তাই সেখানে মহাজগতের দূরত্ব হিশেবের মতো মাইলের বদলে সময় দিয়ে হিশেব করতে হয় দূরত্ব; ওই এলাকার একান্ত অধিবাসী শুধু ওই এলাকার একান্ত অধিবাসীরা। ওই এলাকার অনেক অধিবাসী বাঙলাদেশ, ভারত, মায়ানমার বোঝে না; তাদের কারো হয়তো বাড়ি রাঙ্গামাটির সাজেকের পাশে, মামাবাড়ি মিজোরামে, আর খুন্তুরবাড়ি মায়ানমারে। তারা দেশের সীমা ও ছাড়পত্র ও দলিলহীন স্বাধীন আরণ্য মানুষ। এমন আরণ্য পার্বত্য অঞ্চল বিদ্রোহীদের জন্যে স্বর্গ; তারা স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে পারে অবলীলায়, যেখানে শীতে বরফ জমে না, পায়ের নিচে মরুভূমি জ্বলে না, এবং পাথরের আঘাতে পা থেকে রক্ত বরে না; বরং ছায়া দেয় চিরহরিৎ বৃক্ষ, তৃণা মেটায় ঝরনাধারা, আশ্রয় দেয় নিবিড় উপত্যকা। ওই সীমানার দীর্ঘ এলাকায় বাঙলাদেশের কোনো পুলিশ বা প্রহরী বা সৈনিক নেই; নাড়াইছড়ি থেকে সাজেক (১২২ কিমি), আঁধারমাণিক থেকে মৌদক (১৩২ কিমি), মৌদক থেকে লেবুছড়ি (১০২ কিমি) সম্পূর্ণ অরক্ষিত, সেখানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারও নামে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম রূপময়; অত্যন্ত ভিন্ন তার রূপ সমতল অঞ্চলের থেকে। সেখানে মাইলের পর মাইল ধানক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলে যায় না; সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ালে পৃথিবী একটি বোপের মতো ছোটো হয়ে ওঠে, আর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে চোখের সামনে শুধু অভাবিত বিশ্ব-পাহাড়ের পর পাহাড় বিশাল স্থির ঢেউয়ের মতো পড়ে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে; পাহাড়গুলোকে ঢেকে আছে বিভিন্ন ধরনের বিশাল গাছ, দূর থেকে যাকে ঘাসের আন্তরণ বলে মনে হয়। সেখানে মাথার ওপর দিয়ে এলোমেলো দ্রুত মেঘ উড়ে যায়, আবার ফেনার মতো আটকে থাকে পাহাড়ে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের দিকে তাকালে সৌন্দর্যে বিবশ হয়ে আসে চোখ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়। মানুষ সেখানে বেশি চোখে পড়ে না; পড়লে পাহাড়ের পাশে তাদের ছোট পতঙ্গের মতো তুচ্ছ মনে হয়; সেখানে মহান হচ্ছে সবল প্রকৃতি, মানুষ নয়। সেখানে মাঝেমাঝে চোখে পড়ে আঙনে পোড়া পাহাড়; যেনো আঙন লেগে পুড়ে গেছে পাহাড়গুলোর ছাল; দেখে কষ্ট হয়। কিন্তু পাহাড় না পুড়িয়ে উপায় নেই, সেখানে চাষের জন্যে সমভূমি বেশি নেই; তাই পাহাড়িরা পাহাড় পুড়ে পাহাড়ের গায়ে জুম অর্থাৎ চাষ করে- একই সাথে বোনে কয়েক রকম ফসল। দু-তিন বছরেই পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে ওঠে পাহাড়ের মাটি, সেখানে আর ফসল জন্মে না; তাই পাহাড়িরা দু-তিন বছর পর পর পাহাড় বদলায়- এক সময় ছ-সাত বছর পর পর বদলাতো। তাদের জীবন একধরনের পাহাড়ি বাযাবরের। পাহাড়িরা বেশ শক্ত মানুষ, পাহাড় দিয়ে উঠে নেমে বাল্যকাল থেকেই তাদের পা, জংঘা, জঘন পেশল হয়ে ওঠে, তাদের পায়ের গোছা সেখার মতো; তাই একজন পাহাড়ি অবলীলায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে যেতে পারে, কিন্তু সমতলের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে সেখানে বয়ে চলে সরু নদী; এবং অত্যন্ত সরু ছড়ি বা ছড়া বা স্রবনা। স্রবনার জল গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে চলে, এক-আধ ফুটের মতো হয় ওই জলের গভীরতা; পাহাড়িরা ওই ছড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পছন্দ করে। ছড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অনেক সহজ, কেননা তা অনেকটা সমতল, তাতে পাহাড়ে ওঠার কষ্ট হয় না; এবং গিপাসা লাগলে ছড়ার জলেই তৃষ্ণা মেটানো যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী কারা? আমরা এটুকু জানি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী উপজাতীয়রা, যারা নিজেদের 'উপজাতি' বলতে পছন্দ করেন না, বলেন 'জাতি'; আর এ-উপজাতীয়রা কারা? সমতলের আমরা এটুকু জানি যে

এরা চাকমা। একটা বড়ো ভুল ঢুকে আছে আমাদের ভেতরে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয়দের, আর ওই উপজাতীয়রা চাকমা; অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমাদের। এটা এক বড়ো ভুল; সেখানে শুধু চাকমারা নেই, ওই পাহাড়গুলো শুধু চাকমাদের নয়, ওই পাহাড়গুলোতে আছে আরো বারোটি উপজাতি : মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা, বৌম, পাংখু, খুমি, উসাই, খিয়াং, হক, লুসাই, রিয়াং। এদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে চাকমারাই বেশি; পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ৩০৬৬১৬, মারমা (মগ) ১৭৬২৩০, ত্রিপুরা ১০২৪৫৫, মুরং ৩২০৯৮, তঞ্চঙ্গ্যা ২১১৪০, বৌম ৫৫৮৪, পাংখু ১৬৬৮, খুমি ১০৯১, উসাই ৯৬৬, খিয়াং ১৩২৮, হক ৭৯৮, লুসাই ৬৬৯, রিয়াং ২৪৩৪জন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম শুধু চাকমাদের নয়, আরো বহু উপজাতির; এবং বাঙালিরও। ওই পাহাড়ে মানুষদের পাহাড়ি আর অপাহাড়ি, বা উপজাতি ও বাঙালি এভাবে ভাগ করা হয়; এবং এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালির বা অপাহাড়ির সংখ্যা ৩১১৩৬৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট লোকসংখ্যা ৯৭৪৪৪৫; তার মধ্যে উপজাতীয় ৬৬৩০৭৭, আর বাঙালি ৩১১৩৬৮জন। শতকরা হিসেবে সেখানে ৩০.৫৭% চাকমা, ১৬.৬০% মারমা, ৭.৩৯% ত্রিপুরা, অন্যান্য উপজাতি ৬.০৬% আর বাঙালি ৩৯.৩৮%। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরোটি জাতি বা উপজাতি বা গোত্র এক জায়গায় জড়ো হয়ে নেই; বিশেষ এলাকায় জড়ো হয়ে আছে বিশেষ উপজাতি; যেমন— চাকমারা বেশি রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়; মারমাদের ঘনবসতি চন্দ্রঘোনা, বান্দরবান ও লামায়। বিভিন্ন গোত্রের ভাষা আর ধর্মও এক নয়। প্রতিটি গোত্র নিজেদের ভাষা বলে, অন্য গোত্রের সাথে কথা বলে বাঙলায়; আর ধর্মে চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধ; ত্রিপুরারা হিন্দু; লুসাইরা খ্রিস্টান; ব্রো, রিয়াং, খুমি, মরোং, বনজোঙ্গি, পাংখোরা সর্বপ্রাণবাদী। তাঁদের নাম রাখার রীতিতে একটি মিল আছে, সবাই নামের শেষে জাতিপরিচয় ব্যবহার করে; যেমন, কীর্তিমান চাকমা, বিনতা তঞ্চঙ্গ্যা। তাদের কারো কারো নাম বিতর্ক সংকূত, যেমন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয়; আবার কারো নাম তাদের ভাষায়, এবং কিছু নাম আমাদের কাছে পুংলিঙ্গের, কিন্তু আসলে মানুষটি স্ত্রীলিঙ্গ; যেমন : নিশিকুমার চাকমা বা বীরেন্দ্র চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিদের যদি পাহাড়ি হিসেবে ধরি, যেমন সেখানকার বাঙালিরা বলে যে তারা পাহাড়ি বাঙালি, তাহলে দেখা যায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে দশ বছর আগেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না;

হঠাৎ, ১৯৭৯তে, বিপুল পরিমাণ বাঙালির সুপরিচ্ছন্ন অভিবাসনের ফলে পাহাড় এখন বাঙালির হয়ে উঠেছে, বাঙালি এখন পাহাড়ি হয়ে উঠেছে; এবং অশান্তির এটা এখন সবচেয়ে বড়ো কারণ। পাহাড়িরা, বিশেষ করে চাকমারা, মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম তাঁদের; তবে অনেকেই প্রশ্ন করেন দেশের বিশেষ একটি এলাকা কি একান্তভাবেই বিশেষ কোনো গোত্রের হ'তে পারে? দিনাজপুর বিক্রমপুর সিলেট বরিশাল আর সব এলাকার বাঙালি প্রশ্ন করতে পারেন : পার্বত্য চট্টগ্রাম কি আমার দেশ নয়? আমি কি সেখানে বাস করার অধিকারী নই? আমার কি সেখানে কোনো অধিকার নেই? অনেকেই প্রশ্ন করেন যে বাঙলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশের দশ ভাগের একভাগ কি সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে ৬৬৩০৭৭জন বা শতকরা অর্ধেক মানুষের জন্যে? এর উত্তরে চাকমারাও বলতে পারবেন না যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙালির দেশ নয়, তাঁরা সেখানে বাস করার অধিকারী নয়। কিন্তু মুখে না বললেও তাঁরা মনে করেন ওই পাহাড়ি এলাকা একান্তভাবে তাঁদের; এবং তাঁরা বাঙলাদেশেরও অধিবাসী। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চান, এবং চান বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে। আর যদি তা না হয় তাহলে তাঁরা চান, অন্তত মনে মনে, স্বাধীন জুয়ল্যান্ড। এক চাকমা তরুণ আমাকে বলেছেন, 'যে-দেশ আমাকে ভালোবাসে না, আমি তাকে ভালোবাসতে পারি না।' যে-তেরোটি উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করেন, তাঁরা সবাই সমানসংখ্যক যেমন নন, তেমনি সমান অর্থসরও নন; এবং সবাই একাত্মও নন। তাঁদের সমাজ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত; সবার ওপরে রাজারা (রাজা তিনজন- চাকমা, মোং, বোমং), আর সবার নিচে সাধারণ মানুষ। ওই সাধারণ মানুষদের ওপরে আছেন পাড়ার/গ্রামের প্রধান 'কারবারি'রা, তাঁদের ওপরে মৌজার প্রধান 'হেডম্যান'রা; এবং তাঁদের ওপরে আছেন অভিজাতমণ্ডলি, যারা রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, দেওয়ান, এবং চেয়ারম্যান, সাংসদ, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ইত্যাদি। অভিজাতমণ্ডলি ধনী, এবং তাঁরা নানাভাবে সম্পর্কিত;- একই পরিবারের কেউ হয়তো স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যান, কাকী হয়তো প্রাক্তন সাংসদ, মামা হয়তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুযোগসন্ধান বেশ ভোগ করেন, সরকারি পার্টিতে সুন্দরভাবে বোগ দিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলেন, চমৎকারভাবে কাঁটা চামচে খান, ইংরেজিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। রাজারা ছিলেন বিশেষ গোত্রের প্রধান বা গোত্রপতি; তাঁদের প্রধান কাজ

ছিলো খাজনা আদায় করা, এবং এ-কাজটি তাঁরা করতেন 'দেওয়ান'দের দিয়ে। ১৯০০ সালে দেওয়ানিপ্রথা লোপ করা হয়। তাঁদের সমাজে সব সুযোগসুবিধা ভোগ করেছে উচ্চপর্ষায়ের লোকেরা; আর তারা নিজেদের সুবিধার জন্যে উপজাতীয়দের রেখেছে রাজনীতি, শিক্ষা, ও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে। উপজাতীয়ত্ব ও অসহায় দাসত্ব ছাড়া রাজারা তাঁদের আর কিছু দেয় নি; তাঁদের মনেও আর কিছু পাওয়ার বাসনা জাগে নি অনেক শতক। অধিকাংশ উপজাতিই গরিব, অত্যন্ত গরিব।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় এখন যারা আছে, সেগুলো যে তাদের চিরবাসভূমি, তা নয়; বরং এটাই বেশি চোখে পড়ে যে আদিবাসীরাই বিভাঙিত বা গৌণ হয়ে গেছে, আর সেখানে আধিপত্য করছে আশ্রাসনকারীরা বা অভিবাসীরা। চাকমা রাজা মোআন তস্নি পনেরো শতকে (১৪১৮) ব্রহ্মদেশ থেকে তাড়া খেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন রামু ও টেকনাফ এলাকায়; এবং ওখান থেকে বিভাঙিত হয়েছিলো আদিবাসী কুকিরা। তাঁর সাথে ও পরে চাকমা, মারমা (মগ) ও অন্যান্য উপজাতি চট্টগ্রামের নানা এলাকায় এসে বসতি বাঁধে। সতেরো শতকে (১৬৬৬) ভয়াবহ আগুনজ্বের সময় মুঘলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিকার করে, এবং এর শাসনের ভার দেয়া হয় বাঙলার শাসকের ওপর। দিল্লির আধিপত্য চাকমারা মেনে নেয় নি, তারা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে মুঘল আশ্রাসনের; তবে শেষে তারা দিল্লিকে কর দিতে রাজি হয়। বিনিময়ে তারা রক্ষা করে নিজেদের ভৌগোলিক এলাকা, স্বায়ত্তশাসন ও গোত্রীয় সত্তা। মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম বিদ্রোহ। হায়, সমরখন্দের মুঘলরা এসে রাজত্ব করে এদেশে। তখন থেকেই সমতল অঞ্চলের বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ১৭৬০ সালে মীর কাশেম খাঁর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ভার নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; চাকমারা এটাও মেনে নেয় নি;—তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ, যা চলে ২৫ বছর, ১৭৮৫ পর্যন্ত। ১৭৭৭ সালে কুকিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু অন্যদের মতোই ব্যর্থ হয়। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে একটি পৃথক জেলায় পরিণত করা হয়; এবং শাসনের জন্যে নিয়োগ করা হয় একজন তত্ত্বাবধায়ক। ১৯০০ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল বা বিধিমালা' গৃহীত হয়—এটি উপজাতীয়দের বেশ প্রিয়, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত এলাকা'

(ননরেগুলেটেড এরিয়া) ঘোষণা করা হয়। ১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘোষণা করা হয় 'এক্সক্লুসিভ এরিয়া' বা 'একান্ত এলাকা'। ১৯৪৭ সালে ব্র্যাডফ্রিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে; তবে উপজাতীয়দের অনেকেই তার প্রতিবাদ করে এবং ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর তারা রাঙ্গামাটি ও নানা শহরে উড়োর ভারতীয় ও ব্রহ্ম পতাকা। ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'একান্ত এলাকা'র বদলে 'উপজাতীয় এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়; ১৯৬৪ সালে আবার 'উপজাতীয় এলাকা'র মর্যাদা লোপ করে ১৯০০ সালের বিধি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চাকরিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একদল উপজাতীয় তাঁদের দাবি নিয়ে উপস্থিত হন মুজিবের কাছে; তাঁরা হতাশ হন; এর কিছু দিন পর ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজা মং ফ্র সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে সাত জনের আরেকটি দল চার প্রহর দাবি নিয়ে আসেন মুজিবের কাছে, কিন্তু দেখা না পেয়ে ফিরে যান, তবে রেখে যান তাঁদের দাবিগুলো; আর ২৪ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ওই দাবিগুলোই আরো বিস্তৃতভাবে পেশ করেন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণেতাদের কাছে। তাঁর মূল দাবিগুলো ছিলো :

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে;

(২) পার্বত্য আদিবাসী জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে;

(৩) পার্বত্য আদিবাসী রাজাদের দণ্ডর সংরক্ষণ করা হবে;

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।'

মুজিব এর একটিও মানেন নি; শোনা যায় তিনি মানবেন্দ্র লারমাকে বলেন যে 'যা বাঙালি হইয়া যা।' মুজিব বাঙালি হওয়া বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, তা কখনো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি; তবে লারমা বাঙালি হ'তে চান নি। সংসদে খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার সময় ক্রুদ্ধ হয়েই তিনি, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সাংসদ, বলেছিলেন, 'আমি একজন চাকমা। একজন মারমা কখনো চাকমা হ'তে পারে না, একজন চাকমা কখনো ব্রো হ'তে পারে না এবং একজন চাকমা কখনো বাঙালি হ'তে পারে না। আমি চাকমা। আমি বাঙালি নই। আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক, বাংলাদেশি। আপনারাও বাংলাদেশি, তবে জাতি হিসেবে আপনারা বাঙালি।

উপজাতীয়রা কখনো বাঙালি হ'তে পারে না।' পরিহাসের বিষয় হচ্ছে উপজাতীয়রা কেনো, অনেক বাঙালিই আজ বাঙালি হ'তে চায় না, হ'তে চায় বাঙলাদেশি ও মুসলমান। তবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবিগুলো স্বাধিকারের দাবি হ'লেও ওগুলো আধুনিক মানুষের দাবি নয়; কেননা ১৯০০ সালের ম্যানুয়েলে চলতে পারে না বিশশতকের শেষের মানুষের, ওটি সাধারণ উপজাতীয়দের জন্যে চিরদাসত্বের বিধিমালা— সাধারণ উপজাতীয়রা তা জানেনও না; আর বর্তমান কালে রাজাটাজাও চলতে পারে না। তিনি বামপন্থী হয়েও কী ক'রে রাজা চাইলেন, আর সাধারণ মানুষদের ক'রে রাখতে চাইলেন সরকারি কর্মকর্তা, রাজা, দেওয়ান, হেডম্যান, আর কারবারিদের দাস? উপজাতীয়দের রাজাটাজা, দেওয়ান, হেডম্যান, আর কারবারি বাদ দিয়ে হয়ে উঠতে হবে ব্যক্তিঅধিকারসম্পন্ন আধুনিক গণতান্ত্রিক মানুষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষোভ নতুন নয়; এবং কোনো ক্ষোভই কখনোই অমূলক নয়। কোথাও ক্ষোভ থাকলে বুঝতে হবে পেছনে কারণ রয়েছে। বাঙালি যে পাকিস্তানকে লাখি মেরে ভেঙে ফেললো, তা অকারণে নয়; চাকমারা, উপজাতীয়রাও খামোখা বিদ্রোহ করে নি। অনেক দশক ধ'রেই তাদের বুকে ক্ষোভ জ্বলছিলো, ১৯৭৫-এ তা দাউদাউ ক'রে ওঠে; বাঙলাদেশ বিধ্বিত হয়ে দেখে তারই একগোত্র সন্তান বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে। ব্রিটিশপর্বে যে চাকমা মারমা টিপরা আর অন্যরা ভালো ছিলো, তা নয়; তারা একেবারেই ভালো ছিলো না, তবে ভালো ছিলো তাদের রাজরাজন্যরা, তাই ক্ষোভ দেখা দেয় নি। তবে শুরু সেই পাকিস্তানের শুরু থেকে; র‍্যাডক্লিফ কমিশন রক্তাক্ত করেছিলো তাঁদের পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে : তাঁরা পাকিস্তান চান নি। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান তাঁদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়, জলে ডুবিয়ে দেয়;— পাকিস্তানের জন্যে যা ছিলো বিদ্যুৎ, তাঁদের জন্যে তা ছিলো বিপর্যয়। কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে গিয়ে ডুবে যায় তাঁদের বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি এবং বাড়িঘর; ৫৪,০০০ একর বা ৩৫০ বর্গমাইল উর্বর জমি হারিয়ে যায় কৃষিমহুদের খল জলের তলে, এবং ১০০,০০০ চাকমা পরিণত হন উদ্ধারহীন। তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো পাকিস্তান (বিদ্যাপ্রতি পাঁচ টাকা!); তার জন্যে দেয়ার কথা ছিলো ৫ কোটি টাকা, তবে দেড় কোটি টাকার বেশি দেয়া হয় নি। ওই টাকাও তাঁদের হাতে বিশেষ পৌছে নি, একটা বড়ো অংশ খেয়ে নিয়েছিলো স্বাভাবিকভাবেই ও আমলারা, আর বাকি অংশ কখনো ছাড়াই হয় নি। তার দিয়ে

বিদ্যুৎ আসতে দেখে উল্লসিত হয়েছিলো বাঙালিরা, একটি বিশাল কাজ করেছে ভেবে নিজেদের প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছিলো সামরিক শাসকেরা, এবং সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো উদ্ধাত্তদের কথা। তখন বৈদ্যুতিক তার দিয়ে শুধু বিদ্যুৎ বইতো না, দীর্ঘশ্বাসও বইতো। ষাটের দশকে পাহাড়িরা রাজনীতিকভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন নি; তাঁদের প্রতিবাদ ও দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে পাহাড়ে নীরবে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিশে গিয়েছিলো, দেশের সমভূমি পর্যন্ত পৌছাতে পারে নি। কাণ্ডাই উপকারই করেছে জাতির, কিন্তু যার ক্ষতি হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে জাতির কল্যাণে তার কিছু যায় আসে না। তবে যারা জন্মেছে কাণ্ডাইয়ের পরে, তাদের কাছে কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়তো ক্ষোভের কারণ নয়, আর কাণ্ডাই হ্রদ তাদের জন্যে সুখের। পূর্বপুরুষের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে অনেক সময় রচিত হয় উত্তরপুরুষের সুখ।

ব্রিটিশ সরকার, ১৯০০ সালে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানেজমেন্ট' নামে এক বিধিমালা প্রণয়ন করে, যাতে একে নির্দেশ করা হয় 'অনিয়ন্ত্রিত বা অশাসিত এলাকা'রূপে। এ-বিধিটি যদিও অন্তঃসারশূন্য, মানুষের পক্ষে এতে মূল্যবান কিছুই নেই, এর অনেকটাই শোচনীয়ভাবে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে, তবু এটি খুবই প্রিয় পাহাড়িদের কাছে। এতে পার্বত্য জনগণের অধিকার, স্বার্থ, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি, সংস্কার-কুসংস্কার সংরক্ষণের কথা বলা হয়; কিন্তু তাঁদের কোনোই আধুনিক অধিকার দেয়া হয় নি; সাধারণ মানুষকে ক'রে রাখা হয়েছে দাস; এতে বলা হয়েছে সরকারি কর্মকর্তারা, আর রাজারা, হেডম্যানরা, কারবারিরা চাইলে সাধারণ উপজাতীয়রা বাধ্য থাকবে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের সমস্ত কাজ ক'রে দিতে। এটা ভালো শুধু তাঁদের প্রভুদের জন্যে। এটি পেয়ে পাহাড়িরা সুখী থাকে যে তাঁদের আদিম রীতিনীতির ওপর ব্রিটিশ রাজবাহাদুর হাত দিচ্ছে না। কিন্তু ব্রিটিশ নিজের হাত খুবই শক্ত রাখে যেখানে শক্ত রাখার; অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলাপ্রশাসককে ক'রে তোলা হয় সর্বশক্তিমান, সে-ই রাজবাহাদুর বা লাটরূপে শাসন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, তার সিদ্ধান্তই হয় চূড়ান্ত। আজো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ, এমনকি অভিজাতরাও, জেলাপ্রশাসককে অশেষ ভক্তিপ্রজ্ঞা করে, এবং 'ডিসি বাহাদুর' বলে। এই বিধান পার্বত্য চট্টগ্রামকে অবশ্য পাহাড়িদের একান্ত নিজস্ব এলাকা ব'লে স্বীকার করে, এবং বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশ অনেকটা নিষিদ্ধ করে। বাইরের কেউ যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে বা বাস করতে চাইতো, তাকে জেলাপ্রশাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। তবে ১৯৩০ সালে

এ-বিধান বাতিল করা হয়; তখন থেকে যে-কেউ সেখানে যেতে, থাকতে, ও ব্যবসাবাগিচ্য করতে পারে। এটা ভালো লাগে নি পাহাড়িদের, তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন; কেননা তাঁরা থাকতে চেয়েছেন নিজেদের সীমাবদ্ধ, বাইরের সাথে সম্পর্কহীন, আদিম তিব্বতে। অবশ্য সমতল ভূমির লোভেরও কোনো শেষ নেই; দলে দলে সমতলীয় লোভ চুকতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে, এবং তাদের অশেষ ক্ষুধায় ওই পাহাড় জীর্ণ হয়ে ওঠে। কথা হচ্ছে পাহাড়িরা কি চিরকাল পাহাড়ি থাকবেন? যাপন ক'রে যাবেন তথাকথিত সহজ সরল অভিলাষহীন জীবন? যোগ দেবেন না আধুনিক জীবনের সঙ্গে? তাঁরা কেনো শুধু আনন্দ যোগাবেন নৃতাত্ত্বিকের মনে, হয়ে থাকবেন তথাকথিত সভ্যদের দেখার জিনিশ?

জাতির জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল মানুষেরা, বা তাঁদের প্রধানেরা : ১৯৪৭-এ তাঁরা পাকিস্তান চান নি, কিন্তু তাঁরা পড়েন পাকিস্তানে; আবার ১৯৭১-এ তাঁরা বা তাঁদের বড়ো অংশ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ চান নি, বা সমর্থন করেন নি; চান পাকিস্তান, সমর্থন করেন পাকিস্তানকে। নেতারা জাতিকে কতোটা ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, তার উদাহরণ পাই পার্বত্য চট্টগ্রামে। তবে ১৯৪৭-এর ব্যাপারটিকে ঠিক ভুল বলতে পারি না, এটাকে বলতে পারি নিয়তির পরিহাস; তাঁদের পক্ষে ভারতকে চাওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন, যোগ দিতে চান ভারতের সাথে; এমনকি কামিনীমোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি চাকমা প্রতিনিধিদল বোম্বাই, দিল্লি, ও কলকাতায় গিয়ে গান্ধি, কপালিনি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে দেখা ক'রে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে; এবং তাঁরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তানি স্বাধীনতার পর চাকমারা কয়েক দিন ধ'রে রাজসামাটিতে উড়োন ভারতের পতাকা, আর বান্দরবানে মারমারা উড়োন ব্রহ্মদেশের পতাকা; এবং পাকিস্তানি বেগুচবাহিনী অনতিবিলম্বে দমন করে তাঁদের বিদ্রোহ। ১৯৭১-এ বেদনাদায়ক ভুল করেন চাকমা ও মারমা নেতারা ও রাজারা; তরুণরা অনেকেই যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু সমাজপতিরা মুক্তযুদ্ধকে সমর্থন না ক'রে সমর্থন করেন পাকিস্তানকে। ত্রিপুরারা অবশ্য যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, মাণিকছড়ির মোং রাজা মোং প্র সাইন চৌধুরীও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন; কিন্তু সাধারণভাবে পাহাড়িরা ছিলেন

পাকিস্তানের পক্ষে। কী করে তাঁরা এটা করতে পারলেন? যে-চাকমারা ক্ষুব্ধ ছিলেন পাকিস্তানের ওপর, যে-লারমা ভাইয়েরা ছিলেন মার্ক্সবাদী, ভাবছিলেন পাকিস্তান থেকে মুক্তির কথা—(ত্রিদিব রায় আর অউৎ ও প্রর মতো রাজারা না হয় নানা সুযোগসুবিধা পেয়ে দালাল হয়েছিলো পাকিস্তানের), তাঁরা কেনো সমর্থন করলেন পাকিস্তানকে? স্বাধীনতার পর তাঁরা জাতিগতভাবে পড়েন মুজিবাহিনীর রোষে—নেয়া হয় নানা ভয়ংকর প্রতিশোধ; তাই চাকমা ও মারমারা উল্লাসের সাথে উপভোগ করতে পারেন নি স্বাধীনতার সূচনার সময়টি।

স্বাধীনতার পর পাহাড়িরা কামনা করেন স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। তাঁদের কাছে এটা মনে হয় স্বাভাবিক, কিন্তু বাঙলাদেশের অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে এটাকে মনে হয় দ্বিগুণ স্বাধীনতা উপভোগ-অস্বাভাবিক। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে-দাবিতুলো পেশ করেছিলেন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে, সেগুলো সত্যিই মানার মতো ছিলো না, তাতে বাঙলাদেশের ভেতরে সৃষ্টি হয়ে যেতো স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বা জুম্মদেশ বা জুম্মল্যান্ড—যেমন চায় শান্তিবাহিনী। তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন, তবে আওয়ামি লিগের ছিলেন না, স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে তিনি সদস্য হয়েছিলেন, এবং আওয়ামি লিগের নেতাদের কাছে প্রিয় ছিলেন না; মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ঘোষণা করেন বিদ্রোহ; এবং অশান্ত হয়ে ওঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম। জিয়াউর রহমানের সময় বিদ্রোহ বেশ বেড়ে ওঠে; এবং তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক লক্ষ বাঙালি চুকিয়ে দেন (১৯৭৯)। তাঁর বুদ্ধিটা ছিলো সেনাপতির বুদ্ধি, যা মানবতাবাদীদের কাছে পীড়াদায়ক, আর বাস্তববাদীদের কাছে চমৎকার : তিনি ভেবেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে হবে পাহাড়িদের সংখ্যা কমিয়ে আর মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে। যদি বাঙালিরা সেখানে টিকে থাকতে পারে, তবে ২০৩০-এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমান হবে প্রধান জনগোষ্ঠী—বাস্তবায়িত হবে সেনাপতির স্বপ্ন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমান ঢোকানোর সমস্যা বেড়েছে, আর সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা কমেছে। চমৎকার মানবজীবন, একই জিনিশ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দেখায়!

পৃথিবীতে যেমন সেনাপতি আর জেনারেল আছে, তেমনি আছে বিদ্রোহীও। উপজাতীয়রা সরল শান্ত মানুষ (অনেকে অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন; তাঁদের মতে মঙ্গোলীয়রা বাইরে থেকে দেখতে শান্ত

সরল, কিন্তু ভেতরে বিপরীত; মঙ্গোলীয় ধ্বংসযজ্ঞে ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা ভ'রে আছে); শতকের পর শতক ধ'রে তারা শোষিত ও শিক্ষাহীন। ষাটের দশকে চাকমারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করেন, এবং তাঁরাই উপজাতীয়দের মধ্যে বিকাশ ঘটান রাজনীতিক চেতনার। রাজনীতিক চেতনা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা; মানবেন্দ্র লারমা নিজে ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক (ও আইনজীবী); পরে দেখা যায় শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ নেতাই শিক্ষক। এ-কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহকে 'প্রধান শিক্ষকদের যুদ্ধ'ও বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ হঠাৎ ঘটে শি, ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়েছেন বিদ্রোহের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন মার্ক্সবাদী 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'-এর সদস্য; এবং ১৯৬৬ সালে ঢাকায় ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠার করেন 'উপজাতীয় ছাত্র সমিতি'। ১৯৬৯-এ পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় রাজ্জামাটিতে। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে মানবেন্দ্র লারমা গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি', যেটি মাওবাদী রাজনৈতিক দল 'রাজ্জামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টি'র বাহ্যিক রূপ। ১৯৭২ সালেই দেখা দেন আরেক নতুন তরুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা, প্রীতিকুমার চাকমা, যিনি আবার সক্রিয় ক'রে তোলেন পাহাড়ি ছাত্র সমিতিকে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির ইটছড়ির জঙ্গলে বিকশিত হয় 'শান্তিবাহিনী'। এটি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সশস্ত্র শাখা, যার নাম রাখা হয় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ডাকনাম শান্তি বা শম্ভু অনুসারে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' হচ্ছে পাহাড়িদের 'সিনফেন', আর 'শান্তিবাহিনী' তার 'আইআরএ'। এখানে দেয়া শুরু হয় অস্ত্রপ্রশিক্ষণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক পরিবার লারমাপরিবার; ওই পরিবারেরই দুই ভাই মানবেন্দ্র লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যার ডাকনাম শম্ভু লারমা, পাহাড়িদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন বিদ্রোহী রাজনীতি। তাঁরা দু-ভাই সশস্ত্র বিদ্রোহও দেন নেতৃত্ব। ১৯৭৩-এ মানবেন্দ্র লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন; এবং দেখতে পান বাংলাদেশ সংসদ পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা শুনতে রাজি নয়। ১৯৭৩-৭৪ সময়ে চলতে থাকে শান্তিবাহিনীতে সদস্য সংগ্রহ, দেয়া হ'তে থাকে তাদের প্রশিক্ষণ। ১৯৭৪ সালে শান্তিবাহিনী ভারতের কাছে সাহায্যের জন্যে যোগাযোগ করে; ভারত তা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকারকে। ১৯৭৪-এ লারমা যোগ দেন

বাকসালে, হয়তো তিনি ভেবেছিলেন ক্ষমতার সাথে থেকে অবস্থার বদল ঘটানো যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের। ১৯৭৫-এর আগস্টে মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর মানবেন্দ্র লারমার সব আশা পরিণত হয় নিরাশায়; তিনি সব ছেড়ে প্রবেশ করেন অরণ্যে, শুরু করেন সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৯৭৫-এর নভেম্বরে তিনি একবার জিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন; তবে কিছু দিন পরই ভারত তাঁকে ডাকে, এবং শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে চায়। শান্তিবাহিনী তার প্রথম আক্রমণ চালায় ১৯৭৬-এ : আক্রমণ করে একটি পুলিশ দলের ওপর। কিছু দিন পর শত্রু লারমা ও চবরি মারমা ধরা পড়েন সেনাবাহিনীর হাতে; এবং ১৯৮১ পর্যন্ত বন্দী থাকেন। ১৯৮১তে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার জন্যে তাঁদের মুক্তি দেয়া হয়; তবে মে মাসে জিয়া নিহত হ'লে সব পণ হয়ে যায়। কোনো অঞ্চল যখন বিদ্রোহ করে, তখন নানা বিদ্রোহী উপদল দেখা দেয়; পার্বত্য বিদ্রোহীদের মধ্যেও দেখা দেয় নানা উপদল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব; তার মধ্যে প্রধান দুটি : লারমাবাহিনী ও প্রীতিবাহিনী, এবং এ-দু-বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্বও কম নেই। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে লারমাবাহিনী হত্যা করে প্রীতিবাহিনীর অস্ত্রগুরু অমৃতলাল চাকমাকে; এবং ১০ নভেম্বরে প্রীতিবাহিনী কয়েকজন সর্দারসহ হত্যা করে মানবেন্দ্র লারমাকে। তখন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' ও 'শান্তিবাহিনী'র প্রধানের দায়িত্ব নেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় বা শত্রু লারমা। এখন যে-শান্তি আলোচনা চলছে, তা চলছে শান্তিবাহিনীর সাথে; প্রীতিবাহিনী এর বিরোধী ব'লে রটনা রয়েছে। প্রীতিবাহিনীর হিংস্রতাকে ভয় পায় পাহাড়িরাও; তবে তাঁদের অনেকে মনে করেন যে প্রীতিবাহিনী ব'লে আর কিছু নেই, প্রীতিকুমার বিদ্রোহ ছেড়ে এখন ভারতে সুখে সংসার করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৪ বছর ধ'রে যা চলছে, সমরবিদ্রোহ তাকে বলেন 'ইসারজেলি'; আবার ইসারজেলিকে বলা হয় এক ধরনের 'নিম্নতীব্রতার বিরোধ'। এমন নিম্নতীব্রতার বিরোধ কয়েক দশক ধ'রে চললে বোঝা যায় তার ভবিষ্যৎ নেই; পার্বত্য বিদ্রোহেরও সম্ভবত ভবিষ্যৎ নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিদ্রোহ, আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লারমা ও প্রীতিবাহিনীর বিদ্রোহ চরিত্র ও স্বভাবতে বিপরীত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মতো বড়ো অঞ্চল নয়-মূলত একটি জেলা মাত্র, সেখানে কোনো শেখ মুজিব নেই, এবং তাদের সাহায্য করার জন্যে কোনো ইন্দিরা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, এবং বাংলাদেশকে ভেঙে একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া আর কারো লাভ ও সুখ নেই। কোনো বিদ্রোহই চলতে পারে না যদি বিদ্রোহীরা পাশের দেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পায়। লারমা ও প্রীতিবাহিনী

ভারত ও মায়ানমারে আশ্রয় পেয়েছে, পেয়েছে নানা সহযোগিতা (প্রথম দিকে শান্তিবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিলো দক্ষিণ মিজোরামে, পরে স্থানান্তরিত হয় দক্ষিণ ত্রিপুরায়), নইলে এতোদিন টিকে থাকতে পারতো না; তবে ওই সাহায্য টিকে থাকার সাহায্য, জয়ের সাহায্য নয়। ভারত ও মায়ানমার জানে বিদ্রোহীদের বিজয়ী ক'রে কোনো লাভ নেই; বিজয়ী করা সম্ভব নয়, এবং জুয়াল্যান্ড বাস্তবসম্মত হবে না। র‍্যাডক্লিফও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন নি এ-যুক্তিতে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থনীতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পূর্ববঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশও আশ্রয় দিয়ে এসেছে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের; এখন আশ্রয় দিচ্ছে না ব'লে তারা গিয়ে ঢুকছে ভুটানে, আর ভারতীয় বাহিনী তাদের দমন করার জন্যে ঢুকতে চাচ্ছে সেখানে, এবং বড়ো সমস্যায় ফেলে দিয়েছে দেশটিকে। শান্তিবাহিনীর ২৪ বছর টিকে থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল; বিদ্রোহীদের জন্যে এটা এতো চমৎকার জায়গা যে না-জিতে ও না-হেরে সারা জীবন সেখানে কাটিয়ে দেয়া সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহীর সংখ্যা কতো? সেখানে এখন সম্ভবত ৩০০০-এর মতো সশস্ত্র বিদ্রোহী রয়েছে; এক সময় ছিলো ৫০০০-৬০০০, এবং তাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলো ৫০,০০০-এর মতো প্রশিক্ষিত গ্রামবাসী। তাদের অস্ত্রগুলোও বিশেষ উন্নত নয়। তারা প্রধানত ভারত থেকেই পায় অস্ত্রশস্ত্র; তবে কিছু চিনা অস্ত্রও তারা পেয়েছিলো একান্তরে পাকিস্তানবাহিনী ও রাজাকারদের থেকে। শান্তিবাহিনী সাধারণত ব্যবহার করে চিনা রাইফেল, সাবমেশিন গান, হাফা মেশিন গান, ৩০৩ রাইফেল, ভারতীয় এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, চেক আধাবয়ংক্রিয় রাইফেল, বন্দুক, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত পিস্তল ও বন্দুক, হাতগ্রেনেড, মর্টার, বিস্ফোরক প্রভৃতি। তারা সাধারণত প্রশিক্ষণ পেয়েছে ভারতে ও মায়ানমারে : ১৯৭৬-এর দিকে তারা প্রশিক্ষণ পেতো মায়ানমারে, আর দেবাদুনে প্রশিক্ষণ পেয়েছে বিদ্রোহীদের অনেক নেতা। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোনো প্রশিক্ষণ শিবির নেই বললেই চলে; তবে সাজেকের উত্তরে যেখানে একশো কিলোমিটারের মতো এলাকা অরক্ষিত, সেখানে তাদের প্রশিক্ষণ চলে।

তারা গেরিলা যোদ্ধা; আর পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিশেষ ক'রে তার পূর্বাঞ্চল, গেরিলা যোদ্ধার জন্যে স্বর্গের থেকেও উত্তম। তবে বাংলাদেশে তাদের কোনো স্থায়ী শিবির নেই, যদিও লুকিয়ে থাকার জন্যে দুর্গম নিম্নস্থান ও ঝোপের অভাব নেই। সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সাধারণত বাংলাদেশের সীমানার অপর পাশে থাকে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের পরিকল্পনা

বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। তারা সাধারণত হঠাৎ আক্রমণ করে নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর; আক্রমণ করে বাঙালি পল্লীগুলোর ওপর; বাঙালি ও সেনাবাহিনীর সহযোগী পাহাড়িদের হত্যা করে, অপহরণ করে বাঙালি, সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের, যেমন যে মাসে তারা অপহরণ করে খানচির খানানির্বাহীকে; সেতু ধ্বংস করে, বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন করে, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে উপজাতীয়দের ভারতে শরণার্থীরূপে যেতে বাধ্য করে। মাঝেমাঝে তারা বেশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডও চালায়; যেমন গত বছর হত্যা করে ২৯জন কাঠুরেকে, যাদের তারা টুকরো টুকরো করে কাটে। তাদের চেষ্টা হচ্ছে জনগণকে ভুলে যেতে না দেয়া যে বিদ্রোহ চলছে। তারা নিজেরাও হয়তো জানে তাদের স্বপ্ন কখনোই বাস্তবায়িত হবে না, তবে স্বপ্ন থেকে সঁরে আসাও অসম্ভব অনেকের পক্ষে; বিদ্রোহ করে করে তারা বিদ্রোহে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্নই শুধু নয়, বিপুল অর্থও হয়তো তাদের বিদ্রোহ থেকে সঁরে আসতে দিচ্ছে না। গুরুতর দিকে তাদের আনন্দের সাথে টাকা ও সব কিছু দিয়ে সাহায্য করতো পাহাড়িরা; এখন ওই দরিদ্র মানুষদের দেয়ার মতো আর টাকা নেই, আনন্দের সাথে সাহায্য করার মতো আবেগও নেই। তাই বিদ্রোহীরা চাঁদা তোলে। তারা চাঁদা হিশেবে উঠিয়ে থাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, বছরে প্রায় ২০ থেকে ৩০ কোটি; আর শান্তিবাহিনীর সাথে 'পাহাড়ি ছাত্রপরিষদ', 'পাহাড়ি নারীপরিষদ'ও চাঁদা তুলে থাকে। ১৯৯২ সালে নিজেদের ঘোষিত 'যুদ্ধবিরতি'র পর চাঁদা তোলাই হয়ে উঠেছে তিনটি পরিষদের প্রধান কাজ; এবং তারা এমন নিপুণভাবে চাঁদা তুলছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি কর্মচারীরাও চাঁদা দিচ্ছে, এবং চাঁদা দিচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশবাসী। যে চন্দ্রঘোনার কাগজ কিনছে, বাঁশ, কাঠ, বা অন্য কিছু কিনছে পার্বত্য চট্টগ্রামের, সে-ই চাঁদা দিচ্ছে শান্তিবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীকে। তারা চাঁদা তোলার যে-পদ্ধতি বের করেছে, তা কর আদায়ের নিপুণতম পদ্ধতি, যার থেকে কারো রেহাই নেই। সেখানকার চাষী, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী, এবং সবাই নিয়মিতভাবে চিঠি পাচ্ছে চাঁদা দেয়ার, আঁকাবাঁকা বাঙলা বর্ণমালায় লেখা সেই সব চিঠি, চিঠিতে অত্যন্ত উচ্চ হারে চাঁদার পরিমাণও বেঁধে দেয়া হচ্ছে, এবং নীরবে ওই চাঁদা তুলে দিতে হচ্ছে তাদের প্রতিনিধিদের হাতে। চাঁদার হার সেখানে একটু বেশিই। এই সুযোগে শান্তিবাহিনীর নামে দেখা দিয়েছে নানা বাহিনী, তারাও চাঁদা বা কর তুলছে; কর না দিয়ে উপায় নেই; না দেয়ার পুরস্কার মৃত্যু। মৃত্যু কেউ পছন্দ করে না, তাই চাঁদা দিতেই হচ্ছে। সরকারের এমন কোনো শক্তি নেই, যা দিয়ে চাঁদা

দেয়া বন্ধ করতে পারে। শান্তিবাহিনীর উচ্চনেতারা বছরে একবার বা দু-বার বাজেট তৈরি করে; তাদের প্রত্যেক এলাকার জন্যে ধার্য করে বিশেষ পরিমাণ কর। তারা কর ধার্য করে বনের গাছকাটা, সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ, কৃষির ওপর; তারা কর ধার্য করে সব ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী, জেলের ওপর; এবং মাঝেমাঝে পণ আদায়ের জন্যে অপহরণ করে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের। যেমন যে মাসে এক থানানির্বাহীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় মায়ানমারে, দাবি করে দু-কোটি টাকা; কিন্তু সেনাবাহিনী পণ না দিয়েই উদ্ধার করে তাঁকে। ১৯৯২ সালে শান্তিবাহিনী ঘোষণা করে 'যুদ্ধবিরতি'; এর পর তারা ৩৪বার যুদ্ধবিরতির সময় বাড়িয়েছে এবং হয়তো ১০০০ বার যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে— কয়েক দিন আগেও তারা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাড়িয়েছে যুদ্ধবিরতির সময়, এবং এ-সময়ে চাঁদা তোলাই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান যুদ্ধ। অস্ত্র রেখে তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চাঁদা তোলায়; যুদ্ধবিরতির সুযোগে তাদের চাঁদা তোলা হয়ে ওঠে অবাধ; কেউ তাদের বাধা দিতে পারে না। পাহাড়ি ও অপাহাড়িরা ভয়ে চাঁদা দিতে থাকে; সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিতে পারে না যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে যে নিরস্ত্র কাউকে সেনাবাহিনী ধরতে পারবে না। রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বনভূমির ১৫ জুন ১৯৯৭-এর সংখ্যায় বড়ো শিরোনামে সংবাদ বেরিয়েছে যে 'খাগড়াছড়ির ঘরে ঘরে উড়ো চিঠি' জনমনে আতংক'; এবং সংবাদে বলা হয়েছে : 'খাগড়াছড়ি জেলাশহরের ঘরে ঘরে উড়ো চিঠির কারণে জনমনে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। শহরে ও বেশ কয়েকটি গ্রামে চাঁদা দাবী করে ঘরে ঘরে উড়ো চিঠি বিলি করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী থেকে শুরু করে বিলুপ্ত পরিবারসমূহকে বিভিন্ন অংকের চাঁদা প্রদানের তারিখ নির্ধারণ করে চিঠি দেয়া হচ্ছে। নির্ধারিত তারিখে চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে কুল পড়ুয়া ছাত্রদেরকে অপহরণ করার হুমকী প্রদান করা হয়েছে। অনেকেই ছেলেমেয়েকে কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।' শান্তিবাহিনী বুঝতে পেরেছে অস্ত্রের থেকে অনেক শক্তিশালী ও মনোরম অর্থ।

শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহের সূচনার, বিশেষ করে বিদ্রোহের বিকাশের কালে বাংলাদেশ নিজেই অসুস্থ ছিলো রাজনীতিকভাবে : নিহত হন মুজিব, উধান ঘটে বিশ্বাসঘাতকদের, একের পর এক ঘটে সামরিক অভ্যুত্থান, নানা রকম হত্যায় ও পুনরহত্যায় ভরে ওঠে দেশ, দেখা দেয় ক্ষুদ্র সামরিক একনায়কগণ, যারা ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলকে পিষতে থাকে বুটের নিচে; বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পায় অনেকটা পাকিস্তানের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে বাংলাদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কী ঘটছে বাংলাদেশের মানুষ তা জানতেও পারে না, তাদের

জানতে দেয়া হয় না; এবং তারা যতোটুকু জানে তাতে সহানুভূতিপরায়ণ হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের প্রতি। সাধারণ মানুষ তো জানেই না, এমনকি সচেতন যারা, সেই লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও জানতে পারেন না কী ঘটছে পার্বত্য চট্টগ্রামে; তাঁরা মনে করেন সামরিক একনায়কেরা যেমন দেশ দখল করেছে, তেমনি তারা পীড়ন চালাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। সামরিক বাহিনীর ওপর পাকিস্তানপর্ব থেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বাঙালি; তারা পাকিস্তানে দেখেছে অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থান, দেখেছে আইউব-ইয়াহিয়ার মতো দানব; এবং তাদেরই প্রেতের পুনরাবির্ভাব দেখতে পায় জিয়া ও এরশাদের মধ্যে। জিয়া ও এরশাদ যা উপভোগ করার তা করেছে, পনেরো বছর বাঙলাদেশকে রেখেছে বুটের নিচে; এবং খুবই ক্ষতি ক'রে গেছে বাঙলাদেশের সামরিকবাহিনীর : তারা নষ্ট ক'রে গেছে বাঙলাদেশের সামরিকবাহিনীর ভাবমূর্তি। জনগণের চোখে সামরিকবাহিনী হয়ে ওঠে খলনায়ক; জনগণ ও সামরিকবাহিনীর মধ্য সৃষ্টি হয় ঔপনিবেশিক দূরত্ব; অন্য দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের ভাবমূর্তিটি তাদের চোখে বেশ উজ্জ্বল। জনগণ ও সামরিকবাহিনীর মানসিক ও বাস্তব দূরত্বের ব্যাপারটিকে চমৎকারভাবে কাজে লাগায় শান্তিবাহিনী; তারা নিজেদের ও তাদের বিভিন্ন প্রকাশ্য শাখা-পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি নারীপরিষদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আকর্ষণ করে বাঙলাদেশের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি (-আমি দশ বছর আগে তাদের পক্ষে লিখেছিলাম 'রক্তাক্ত বিপন্ন পাহাড়' নামে একটি আবেগঘন রচনা), এবং বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকারবাদী সংস্থার সহায়তা। বাঙলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা যখন বিদেশে- সোমালিয়া বা বসনিয়া বা কম্পুচিয়া বা হাইতি- গিয়ে পালন করে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব, প্রশংসিত হয় তারা; কিন্তু নিজেদের দেশে, খুবই বেদানাদায়ক যে, তাদের ভাবমূর্তিটি কালিমালিঙ- কয়েকটি উচ্চাভিলাষীর জন্যে।

শান্তিবাহিনীর শাখাগুলো যে-সব প্রচারপত্র ও পত্রিকা প্রকাশ করে, সেগুলো পড়লে মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে বা চলছিলো উনিশশো একাত্তর। তাদের বিবরণে পাই সৈনিকেরা গিয়ে পাড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাইফেল চালাচ্ছে, অপহরণ করছে অখ্যাত ও বিখ্যাত মেয়েদের, উলঙ্গ করছে তাদের, এবং চালাচ্ছে অবাধে ধর্ষণ। যারা একাত্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে, তারা এসব বিশ্বাস না ক'রে পারে না- না ঘটলেও তাদের মনে হয় এসব ঘটেছে; এসব বিশ্বাস করাই হয়ে ওঠে মানবাধিকারবাদ ও মানবতাবাদ। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া, সার ক'রে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানোর ঘটনায় পাহাড়িদের

লেখা বই ও প্রচারপত্রগুলো ভ'রে আছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষীরা এসব করতে পারে। বিপ্লব চাকমার পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে (১৯৯৭) বইটির একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ ভ'রে আছে সামরিক বাহিনীর পীড়নের বিবরণ। বইটিতে পাই এমন সব মর্মান্তিক ঘটনা :

(১) 'ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং হইতে জানুয়ারী ১৯৭৯ইং এর মধ্যে উত্তর কুমা সেনাবাহিনী ক্যাম্পের সদস্যরা ১৫০নং দুমদুম্যা মৌজার আনুমানিক ৫০টি গ্রামের মধ্যে হামলা চালিয়ে ২২টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। আর ৯ই জানুয়ারী ১৯৭৯ইং তারিখে সুবলং উপত্যকার প্রত্যেক গ্রামে হামলা চালানো হয়।'

(২) 'ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ডের পর পাহাড়ীরা ভারতের মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত পাহাড়ী শরণার্থীদের জোরপূর্বক মিজোরাম ত্যাগে বাধ্য করার পর ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ইং তারিখে পাহাড়ী শরণার্থীদের লঞ্চে করে আনার সময় লঞ্চার কেবিনে বি.ডি.আর এর সদস্যরা নিম্নোক্ত মহিলাদের গণধর্ষণ করে। (ক) নিরলতা চাকমা (২৫) স্বামী করুণামোহন চাকমা, গোরস্থান, বরকল। (খ) লক্ষ্মী মিতা চাকমা (১৭) পিতা পত্যা রাম চাকমা, গোরস্থান, বরকল। (গ) সুরঙ্গ দেবী চাকমা (১৮) পিতা রজনী মোহন চাকমা, গোরস্থান, বরকল। (ঘ) বিরবী চাকমা (২৪) স্বামী সুরেশ কুমার চাকমা, ভূষণছড়া, বরকল।'

(৩) '১৯৮৫ইং সালের জুলাই হতে ১৯৯৫ইং সালের জুলাই পর্যন্ত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত গ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলো নিম্নোক্ত তারিখে গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মন্দির পোড়ানো ও ধ্বংস করার কাজে সরাসরি সংযুক্ত ছিল। ক্যাম্পের নাম : মহালছড়ি, গুইমারা, দিঘিনালা, বাঘাইছড়ি, তিন টিলা, দূরছড়ি, বড়ফুল পাড়া, যক্ষাবাজার, তৈনদং, পানছড়ি, ভালছড়ি, বাঘাইছড়ি, লংগুদু, ঝাগড়া, দুদুক ছড়ি, মাটিরঙ্গা, ছি-নালা লোগাঙ, ঝাগড়াছড়ি, শীলবন, বেতছড়ি, কিয়াংঘাট ও ছমনিঘাট, নুনছড়ি, মধ্যপাড়া, ধনপাদা, পান খাইয়াপাড়া।'

বইটিতে ৮২টি অনুচ্ছেদে এমন কয়েক হাজার ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হয়তো এর কিছুটা অতিরঞ্জিত, হয়তো এর অধিকাংশই সত্য। মানুষ যখন বুট আর উর্দি পরে তখন রূপান্তরিত হয়, চোখের সামনে মানুষ দেখতে পায় না; ট্রাফিক পুলিশই যখন বুট প'রে দাঁড়ায় তখন চারদিকে দেখে পশু; তাই

সবশক্তিমান নিরাপত্তাবাহিনীর কথা বলাই বাহুল্য। এই ঢাকা শহরেই কি আমরা বহুবার বুট আর উর্দি আর ট্রাক আর রাইফেল দেখে কেঁপে উঠি নি— স্বাধীন বাংলাদেশে? বাঙালিই যখন কেঁপে ওঠে উর্দি ও বুটপরা বাঙালি দেখে, তখন কী আর কথা চাকমা মারমা টিপরার। সামরিক বাহিনী হয়তো বলবে এসব ঘটে নি, বা এ ছাড়া উপায় ছিলো না— কোনো বিদ্রোহই প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা দিয়ে দমন করা যায় না, রক্ত ঝরাতেই হয়, মানবিকতাকে স্থগিত রাখতেই হয় সাময়িকভাবে; কিন্তু আমরা শুধু ক্ষমা চাইতে পারি।

এ-জাতীয় বিদ্রোহে সেনাবাহিনী হয় ঋণায়ক, শক্তিমানমাত্রই ঋণায়ক; আর বিদ্রোহীরা পায় সব সহানুভূতি, যদিও নৃশংসতার তারাও অতুলনীয়। শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে জিতেছে সেনাবাহিনী, এবং হেরেছে প্রচারে; প্রচারে না হেরে উপায় নেই, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করে গেছে একনায়কেরা। সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি উদ্ধার করা দরকার; তার একটি উপায় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ খুলে দেয়া বাঙালি ও বিশ্বের কাছে, দেশের সচেতন নাগরিকদের অবাধে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা দেখতে দেয়া; এবং সেনাবাহিনী ও দেশবাসীর মধ্যে সমস্ত দূরত্ব দূর করা। দেশে সামরিক বা সামরিকতামুখি গণতন্ত্র থাকলে এটা সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু বিতর্ক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। যখন দেশে একনায়কেরা ছিলো, তখন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একনায়কদের মতোই বিশ্বাস করতো যে অস্ত্রই সমাধান; আর এখন সময় বদল ঘটেছে, তাই তাদের বিশ্বাসেরও বদল ঘটছে—সামরিক বাহিনীও মনে করছে অস্ত্র কোনো সমাধান নয়: সমাধান করতে হবে মানবিক ও রাজনীতিকভাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সামরিক সমস্যা নয়, রাজনীতিক সমস্যা; তাই দরকার তার বাস্তব রাজনীতিক সমাধান।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে অবিচ্ছিন্ন রাখা ও বিদ্রোহ দমনের জন্যে সেনাবাহিনীকে বেশ খাটতে হয়েছে, এবং হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিক্রমপুরের মতো ছোটো ও সমতল নয় যে এক দিনে সবটা ঘিরে ফেলা গেলো; পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানাগত আয়তন যতোটা ভূপ্রাকৃতিক আয়তন তার দশগুণ। একটি পাহাড়ের এ-পাশ থেকে ও-পাশ হয়তো সরাসরি একশো ফুট, কিন্তু পাহাড়টির এ-পাশ থেকে ও-পাশের প্রকৃত দূরত্ব হয়তো ১০০০ ফুট। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অবিচ্ছেদ্য রাখার জন্যে রাসামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে বসানো হয়েছে সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক কেন্দ্র (প্রধান একজন ব্রিগেডিয়ার), প্রতিটি অঞ্চলকে ভাগ করা হয়েছে উপ-অঞ্চলে (প্রধান একজন লেফটেন্যান্ট

কর্নেল), তাকে ভাগ করা হয়েছে উপ-উপ-অঞ্চলে (প্রধান একজন মেজর), এবং একে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পে (প্রধান একজন ক্যাপ্টেন)। ৫০০র মতো ক্যাম্প রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, যেগুলোর অধিকাংশই দুর্গম; ১০০র মতো ক্যাম্প হেলিকপ্টার ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই, আর ৪০০র মতো ক্যাম্প হেলিকপ্টার নামে না। ক্যাম্পগুলো দেখার মতো-অবস্থিত পাহাড়ের ওপরে, উঠতে হয় ২০০ থেকে ৪০০ খাপ পেরিয়ে, ৫৫ বছরের ওপরের অধিকাংশ বাঙালি সেগুলোতে উঠলে হৃদরোগে আক্রান্ত হবে, ব্রিগেডিয়াররাও সেগুলোতে সাধারণত ওঠেন না। ক্যাম্পের ওপরে তৈরি করা হয়েছে বাঁশের আবাস ও প্রহরাঘর। ওই প্রহরাঘরগুলোতে দিনের বেলাও মুখে অল্পত মশারি প'রে দাঁড়িয়ে থাকে সৈনিকেরা। ক্যাম্পের শীর্ষে উঠে তাকালে সৌন্দর্যে বিবশ হয়ে আসে রক্তমাংস; প্রেমিকপ্রেমিকারা সেখানে উঠলে এক অলিঙ্গনেই এক ঋতু কাটিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু ওই পাহাড়ে কোনো প্রেমিকপ্রেমিকা নেই, তারা সেখানে কখনো যেতে পারবে না;—সীমানাপাড়া, সাজেক, ঘনমোড়, তানখাইতং, সুবলং, বিলাইছড়ি, থানচির মতো অসাধারণ দুর্গম সুন্দর স্বর্গে কোনো প্রেমিকপ্রেমিকা নেই, আছে নিঃসঙ্গ তরুণেরা, যারা নিশ্চলক তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে। ওগুলোতে খেতে হয় মেপে মেপে, পানি খুবই দুর্লভ; পাহাড়ের নিচের ঝরনার থেকে বালতি ক'রে উঠাতে হয় পানি। ঝরনায় স্নান ক'রে ক্যাম্পে উঠলে আবার স্নান করতে ইচ্ছে হয়। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররা সুদর্শন ও মেধাবী—ইংরেজি বলতেই তাঁরা বেশি অভ্যস্ত, এটাই তাঁদের বেশ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে দেশবাসীর থেকে; আর সৈনিকেরা দক্ষ। ক্যাম্পগুলোতে তাদের দুটিই প্রধান শত্রু : নিঃসঙ্গতা ও মশা; শান্তিবাহিনী তাদের গৌণ শত্রু। প্রতিটি ক্যাম্পে চারপাঁচজন আক্রান্ত মগজের ম্যালেরিয়ায়, যা হ'লে রক্ষা নেই। এই সম্প্রতি মারা গেছে হৃদয়, সে ক্যাপ্টেন বা সৈনিক ছিলো না, সে বারো বছরের এক কিশোর, এক আঞ্চলিক প্রধানের পুত্র, পিতামাতার সাথে সে ছিলো ওই বনভূমিতে। সেখানে এনোফিলিসই এখন প্রধান শান্তিবাহিনী।

শান্তিবাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে সৈনিক, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, যা মারা গেছে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা খুবই কম; বাঙলাদেশে দুর্ঘটনায় ও সন্ত্রাসে মারা গেছে তার হয়তো একশো গুণ। ১৯৯৭-এর মে পর্যন্ত মারা গেছে ১৭৩জন সৈনিক, ৯৬জন বিডিআর, ৪১জন পুলিশ, এবং আরো কয়েকজন; সব মিলে ৩৪৩জন; বছরে গড়ে ১৫জন; আহত হয়েছে

৩৭৩জন; ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫৬জন। যুদ্ধ করে সশস্ত্র ব্যক্তির, কিন্তু যুদ্ধের পরিহাস হচ্ছে যে যুদ্ধে সশস্ত্র সামরিকেরা যতো মারা যায়, তার থেকে বেশি মরে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। এ-সময়ে অসামরিক ব্যক্তিরাই মরেছে বেশি : বাঙালি ১০৫৪জন, উপজাতীয় ২৩৭জন; আহত হয়েছে ৬৮৭জন বাঙালি আর ১৮১জন উপজাতীয়; অপহৃত হয়েছে ৪৬১জন বাঙালি আর ২৮০জন উপজাতীয়। এ-পরিসংখ্যানটি সামরিক বাহিনীর, শান্তিবাহিনীর পরিসংখ্যানে হয়তো উপজাতীয় মৃতের ও আহতের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়বে। যুদ্ধের বিভীষিকা তাই অসামরিক মানুষেরাই বুঝছে বেশি; আর যতো দিন শান্তি না আসবে তারাই বুঝবে বেশি। এ পর্যন্ত আত্মসমর্পণও করেছে শান্তিবাহিনীর ২৯৯২জন সদস্য; তাদের মধ্যে ১১৯৮ সশস্ত্র, আর ১৭৯৫ নিরস্ত্র।

বিদ্রোহ কখনো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না; শান্তিবাহিনী সামরিকভাবে জিতবে না, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে আদায় করে নিয়েছে নানা অধিকার। সরকার নানাভাবে ভুট করতে চাচ্ছে পাহাড়ীদের; তবে উপজাতীয়রা ওগুলোকে অধিকার বলেই মনে করেন না। পার্বত্য বিদ্রোহের আগে ওই অঞ্চল ছিলো বেশ অনুন্নত, তবে দেড় দশক ধরে সেখানে ব্যয় করা হচ্ছে প্রচুর অর্থ, তৈরি হচ্ছে পথঘাট, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়; উপজাতীয়দের দিচ্ছে নানা বিশেষ সুবিধা। অবশ্য সরকার এতো টাকা দেয় নি পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে তাতে সেখানে বড়ো বড়ো টাকার পাহাড় গড়ে উঠেছে। উপজাতীয়রা বলেন, প্রচুর অর্থ হয়তো দেয়া হয়েছে, তবে সেগুলো হয়তো কাগজই হুদে ফেলে দেয়া হয়েছে; পাহাড়ীদের কোনো উপকারে আসে নি; আর পথঘাট যা হয়েছে, তা সামরিক বাহিনীর জন্যে, পাহাড়ীদের জন্যে নয়। সরকার বলবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতির জন্যে ১৯৭৬-এ গঠিত হয়েছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড’, যার প্রধান চট্টগ্রামের জিওসি। দেশ তখন চালাচ্ছিলেন সেনাপতিরা, তাই একজন সেনাপতিই হন পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও সব কিছুর বিধাতা; এবং এটা ছিলো রাজনীতিকভাবে পুরোপুরি ভুল ও আপত্তিকর সিদ্ধান্ত। ১৯৮৯-এ গঠিত হয় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ’। পাহাড়িরা বলেন, ওটি দেয়া হয়েছে কয়েকটি দালাল তৈরির জন্যে, আর ওটির কোনোই শক্তি নেই। এ-বিধিটির মধ্য দিয়ে উপজাতীয়দের হাতে দেয়া হয়েছে কিছু ক্ষমতা। পাহাড়িরা বলেন, এগুলো কোনো ক্ষমতাই নয়, সব ক্ষমতা রয়েছে চট্টগ্রামের জিওসির, আর ডিসিদের হাতে। এ-বিধি অনুসারে পার্বত্য

চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলায় আছে একটি ক'রে 'স্থানীয় সরকার পরিষদ', যার প্রধানরূপে নির্বাচিত হন একজন উপজাতীয়; ওই পরিষদে আছে আরো ৩০জন সদস্য, যাদের ২০জন উপজাতীয় (১০জন চাকমা, ৪জন মারমা, ২জন তঞ্চঙ্গ্যা, ১জন লুসাই, ১জন পাংখু, ১জন খেয়াং, ১জন ত্রিপুরা), আর ১০জন অউপজাতীয়। ওই পরিষদের চেয়ারম্যান পান উপমন্ত্রী মর্ষাদা, আর সদস্যরা উপসচিবের মর্ষাদা, জেলাপ্রশাসক পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায়ই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়েছে; তবে নির্বাচন হয়েছে একবার; ওই পরিষদগুলোর সময় পেরিয়ে গেলেও আর নির্বাচন হয় নি। আগের চেয়ারম্যান ও সদস্যরাই আজো কাজ করছেন। পরিষদগুলোকে যে-ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তাতে পরিষদই নেবে ভূমিসংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত, কর আরোপ করতে পারবে, নানা নিম্নপদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত পুলিশ নিয়োগ করতে পারবে, ভূমিহীন উপজাতীয়দের মধ্যে ভূমি বন্টন করবে, বাজেট প্রণয়ন করবে; এবং পালন করবে আরো নানা দায়িত্ব। তবে যতো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলা হয়, ততো ক্ষমতা নেই পরিষদের; এটা একটি খঞ্জ সংস্থা। পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন একজন পাহাড়ি, তিনি উপভোগ করবেন উপমন্ত্রীর মর্ষাদা—এটা শুনতে ভালো শোনায়; কিন্তু ডিসি তাঁকে না মানলে তাঁর কিছু করার নেই, কেননা তিনি উপজাতীয়। পাহাড়ি অউপজাতীয়রা অর্থাৎ বাঙালিরা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিধানের কয়েকটি ধারার প্রচণ্ড বিরোধী। তাঁদের মতে এর ফলে তাঁরা উপজাতীতে পরিণত হয়েছেন, তাঁরা হয়ে পড়েছেন নতুন বর্ণবৈষম্যের শিকার। যেমন, কোনো বাঙালি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান হ'তে পারবেন না কখনো—এটাকে তাঁরা মনে করেন তাঁদের অধিকারহরণ। এ-বিধানে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়, এমন কারো কাছে পার্বত্য জেলাগুলোর ভূমি ইজারা দেয়া, বা বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থাকবে একান্তভাবে উপজাতীয়দের। আর পরিষদ সব সময়ই সিদ্ধান্ত নেবে উপজাতীয়দের স্বার্থে; কেননা তারাই ৩১জনের মধ্যে ২১জন। এ ছাড়া উপজাতীয়দের দেয়া হয়েছে কিছু সুবিধা, যা দেয়া হয় নি বাঙালিদের; যেমন, যে-কোনো উপজাতীয় ব্যক্তি শহরের বাইরে ৩০ ডেসিমেল ভূমি বিনামূল্যে পাবেন, কোনো বাঙালি তা পাবেন না; পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ লাখ টাকার সমস্ত ঠিকাদারির কাজ উপজাতীয়রা পাবেন, বাঙালি পাবে না; ব্যাংক থেকে ঋণ

নিলে উপজাতীয়দের সুদ দিতে হবে ৫% টাকা, আর বাঙালিদের সুদ দিতে হবে ১৫% ও শিল্পক্ষেত্রে ১৮% টাকা; উপজাতীয়দের ভূমিকর দিতে হবে নিয়মের অর্ধেক, বাঙালিদের দিতে হবে পুরোটা; আর পাহাড়িদের দিতে হবে না আয়কর, মূল্যসংযোজন কর, ও আরো নানা কর। উপজাতীয়রা বলেন, এগুলো যদি উপকারে আসতো, তাহলে তো উপজাতীয়রা সবাই ধনী হয়ে যেতো, কিন্তু পাহাড় ভ'রেই গরিব। সরকার দাবি করে যে চিকিৎসা, দস্তা ও ক্যাডেট মহাবিদ্যালয়ে, বিভিন্ন সাধারণ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্যে সংরক্ষিত হয়েছে আসন। উপজাতীয়রা বলেন, এসবই লোকদেখানো, আর উপজাতীয়দের মধ্যে দালাল সৃষ্টির জন্যে। যেমন, তাঁদের মতে, সংরক্ষিত আসনগুলোতে কারা স্থান পাবে, তা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিক করে না, করেন চট্টগ্রামের জিওসি; তাই আসন পেতে হ'লে তাঁর অনুগত হ'তে হয়; তিনি ছেলেদের বাদ দিয়ে মেয়েদের আসন দেন, ভালো ছেলেদের বাদ দিয়ে অনুগতদের আসন দেন। তাঁদের মতে, চট্টগ্রামের জিওসিই পার্বত্য চট্টগ্রামে সব; তাঁর খুশিতেই সব হয়; উন্নয়নমূলক কাজগুলোরও তিনিই প্রধান। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে সামরিক শাসন বা ঘটেছে সামরিকীকরণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের অসামরিক প্রশাসন যে বেশ নিক্রিয় ও নিদ্রাতুর ও উদাসীন, তার কারণও হয়তো এই : তাঁরাও হয়তো সামরিক বাহিনীর সব ব্যাপারে প্রাধান্য পছন্দ করেন না, তাই নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে চলছেন তাঁদের নিক্রিয়তা ও নিদ্রাতুরতা ও উদাসীনতা দিয়ে। আমলাদের কাজকর্ম সব সময়ই সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিদ্রোহীরা বা শান্তিবাহিনী বা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা কী চান? তাঁদের কী দাবি? ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধানপ্রণেতাদের কাছে যে-চারটি দাবি পেশ করেছিলেন, তা মেনে নিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠতো স্বাধীন দেশের মধ্যে একটি স্বাধীন দেশ, যেখানে একধরনের ছাত্রপ্রজ্ঞা ছাড়া সমতলের কেউ যেতে বা বাস করতে পারতো না- শুধু সরকারি কর্মচারীরা ছাড়া। তাঁরা যদি ওই স্বাধীন রাষ্ট্রটি পেতেন, তাহলে তা অবশ্য আধুনিক হতো না, হতো একটি আদিম রাষ্ট্র, যেখানে বেশ সুখে থাকতো রাজারা ও নেতারা, আর চিরকালীন দাসত্ব ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিজেদের কথিত সংস্কৃতি ও জাতীয়তা নিয়ে থাকতেন সাধারণ মানুষ; এবং প্রধান গোত্র হতো চাকমা। এখন তাঁরা স্বাধীনতার কথা বা 'অবরোধকারী বাহিনীর হাত থেকে জাতিকে মুক্ত' করার কথা বিশেষ বলেন না, কিন্তু বিশদভাবে পেশ করেন তাঁদের অজস্র দাবি। তাঁরা দাবি প্রণয়নে অর্জন করেছেন বিশেষ দক্ষতা,

পাঁচ দফার দাবির মধ্যে তাঁরা পঞ্চাশটি দাবি চমৎকারভাবে চুকিয়ে দিতে পারেন, যেমন দিয়েছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’ (পাচঙ্গসস) বা শান্তিবাহিনী। পাচঙ্গসস সরকারের কাছে যে-পাঁচ দফা দাবি পেশ করেছে, তাতে দাবি রয়েছে পঞ্চাশটির মতো, যেগুলো মানলে বাংলাদেশ আর একটি অখণ্ড স্বাধীন দেশ থাকে না। তাদের দাবিগুলোতে রয়েছে এমন সব দাবি :

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা;

(২) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা;

(৩) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারেন সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা;

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা;

(৬) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা;

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে “জুম্বল্যান্ড” নামে পরিচিত করা; ইত্যাদি।

অন্য দাবিগুলোতে যাছি না; ওপরের দাবিগুলো মানলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে এক চমৎকার “জুম্বল্যান্ড”, যা বাঙালির জন্যে নিষিদ্ধ দেশ; বাংলাদেশের ভেতরে থেকেও বিদেশ। কোনো বাঙালিই হয়তো এসব দাবি মানতে রাজি হবে না। তবে পাহাড়িরা মনে করেন না যে তাঁদের সব দাবিই মানতে হবে; তাঁদের অনেক দাবিই চাপসূটির জন্যে, যদিও তা প্রকাশ করে ভেতরের বাসনা। আমি যা সহজভাবে বুঝি, তা হচ্ছে বাংলাদেশ তার সব নাগরিকের; পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর সমস্ত অধিকার আছে বাঙালির, আর সারা বাংলাদেশের ওপর সমস্ত অধিকার রয়েছে পাহাড়িদের, ও অন্যান্য উপজাতির। কারো অধিকার একটুও বেশি আর একটুও কম নয়। তবে

বাঙলাদেশে যেহেতু বাঙালি মুসলমানের প্রাধান্য, তাই সংখ্যালঘুরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত, এমনকি পরিকল্পিত বৈষম্যের শিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে যা করা দরকার, তা স্বায়ত্তশাসন বা উপজাতীয় সংসদ বা জুমল্যাত নয়, রাজাটাজা রাখা নয়, তাকে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত করা নয়; দরকার সেখানকার সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি, অতি দ্রুত উন্নতি। আমাদের শোষণ পিতারা যে-অগ্রিম পাওনা আদায় ক'রে গেছেন, তার দেনা শোধবার ভার পড়েছে আমাদের ওপর। ওই দেনাটি অবিলম্বে শোধ করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, আর দেশের কোথাও যদি অশান্তি থাকে, তবে সে-অশান্তি সারা দেশকেই ক'রে রাখে অশান্ত-অসুস্থ। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি অত্যন্ত জরুরি; এবং সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে চলছে শান্তি-আলোচনা। চিরকালই মানুষ শান্তির নামে যুদ্ধ বাধিয়েছে, বাঙলাদেশেও তা প্রচুর দেখা গেছে; এবং আলোচনা ক'রে শান্তি খুবই সম্ভবজনক ব্যাপার। আর শান্তিচুক্তি? চুক্তি কথাটির মধ্যেই রয়েছে চুক্তিভঙ্গের বীজ। ১৯৭৫ থেকেই রাশিরাশি আলোচনা হচ্ছে, - কানে ঘা হয়ে গেছে শান্তি, শান্তি, শান্তি শুনে শুনে, শুধু শান্তি আসছে না; ঘৃণা কমছে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের হৃদয়লো দিয়ে নির্মল জল ও শান্তি প্রবাহিত হচ্ছে না। বাঙালিদের মধ্যে যারা বাজবভাবের, তারা মনে করে তথাকথিত শান্তি-আলোচনা হচ্ছে জঙ্গলের খুনিদের হেলিকপ্টারে ক'রে এনে অতিথিশালায় ব'সে নিরর্থক আলোচনা, তাদের রাইফেল দিয়েই ঠাণ্ডা করা উচিত, আর কপোতবভাবের যারা, তারা মনে করে বিদ্রোহীরা খুনি নয়, তাদের সাথে আলোচনা দরকার, এবং অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা দরকার শান্তি। ১৯৭৫-এর নভেম্বরে মানবেন্দ্র লারমা শান্তি আলোচনার জন্যে যোগাযোগ করেছিলেন জিয়ার সাথে, কিন্তু পরে আর করেন নি; কেননা ভারত তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৮৫তে চট্টগ্রামের জিওসি সরকারি ও ব্রীতিবাহিনীর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি শান্তি আলোচনার আয়োজন করেন, এবং ১৯ এপ্রিলে একটি শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। শম্ভু লারমার শান্তিবাহিনীর সাথে শান্তি আলোচনা শুরু হয় ২১ অক্টোবর, ১৯৮৫তে, সীমান্তবর্তী পূজাগাংয়ে; এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮র মধ্যে আরো পাঁচবার তাঁরা আলোচনায় বসেন, দুবার পূজাগাংয়ে, ও' তিনবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে; কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

এভাবে একনায়ক এরশাদের কাল কেটে যায়; আসে খালেদার কাল, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্যে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

রাজনীতিক কমিটি (প্রধান অলি আহমদ), যার প্রথম বৈঠক বসে ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে। এ-কমিটি ১৯৯৪ সালের মে মাসে শান্তিবাহিনীর সাথে সাতটি বৈঠকে বসে; এবং তৈরি হয় একটি উপকমিটি (প্রধান রাশেদ খান মেনন), যেটি দুদকছড়ায় শান্তিবাহিনীর সাথে বসে সাতবার, শেষ বৈঠকটি হয় ২৫ অক্টোবর ১৯৯৫। এভাবেই কেটে যায় খালেদার কাল; আসে, হাসিনার কাল। শুরু হয় আবার শান্তি আলোচনা, এবং ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি (প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ) আলোচনায় বসে শান্তিবাহিনীর (প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বা শম্ভু লারমা) সাথে। তাঁদের মধ্যে শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৪ মে ১৯৯৭-এ, রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন 'পদ্মা'য়। বৈঠকের পর আবুল হাসনাত জানিয়েছেন 'আমরা সকল বিষয়ে একমত হয়েছি', এবং 'আমরা শিগগির চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছি'; তবে শম্ভু লারমা কিছুই জানান নি। ৩০ জুন ১৯৯৭ তারিখে শান্তিবাহিনীর ঘোষিত যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার কথা, তাই আশা করা যাচ্ছিলো এর আগেই চুক্তি সম্পাদিত হবে; তবে তা হয় নি। শান্তিবাহিনী এর মাঝে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির সীমা বাড়িয়েছে। হাসনাত ও লারমা দলের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, জনগণকে তা জানানো হয় নি, এ নিয়ে অনেকেই উত্তেজিত; এবং ভয় পাওয়ার মতো ঘটনা হচ্ছে যে ওই আলোচনায় জাতীয়তাবাদী দল ও জাতীয় পার্টির সদস্য সাংসদরা অংশ নেন নি। বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে বিপুল সংখ্যক উগ্রপন্থী, যারা মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হ'লে চুক্তি মানবে না, এখনই নানা হুমকি দিচ্ছে, আর শান্তিবাহিনী, জনসংহতি পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, ও নারী পরিষদের মধ্যেও রয়েছে বিপুল সংখ্যক উগ্রপন্থী, যারা নিজেদের সব দাবি পূরণ না হ'লে হয়তো ঘোষণা করবে যুদ্ধ। একটি গুজবও চলছে যে সরকার ভুল লোকের সাথে শান্তি চুক্তি করতে যাচ্ছে, কেননা শম্ভু লারমা বহিষ্কৃত হয়েছেন শান্তিবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে, তাঁর স্থানে এসেছেন চরমপন্থী উষাতন তালুকদার। গুজবটি হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়, হয়তো অর্ধসত্য;— শান্তিবাহিনীর একটি অংশ হয়তো সমর্থন করে তাঁকে, আরেকটি অংশ হয়তো করে না। কিন্তু ভারত কোন অংশের পক্ষে? গুজব হচ্ছে ভারত পৃষ্ঠপোষকতা করছে উষাতনকে; আর এদিকে বাঙলাদেশ চুক্তি করছে তাঁর সাথে, যাকে শান্তিবাহিনী ত্যাগ করেছে, এবং ভারতও স্নেহ করে না। পাহাড়িদের পরিষদগুলোও পড়েছে ভাঙাভাঙির কবলে; যেমন ভেঙে গেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। তাহলে শান্তি কি আরো বহু দূর? শান্তির নামে চালিয়ে যাবো যুদ্ধ, খুন করতে থাকবো নিরীহদের? ২ জুলাই ১৯৯৭-এর দৈনিকগুলোতে সংবাদ

বেরিয়েছে যে শান্তিচুক্তি পিছিয়ে যাচ্ছে, সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর মধ্যে বৈঠক বসবে ১৪ জুলাই; তবে তাতে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত নাও হ'তে পারে। এর অর্থ শান্তি দূরে স'রে যাচ্ছে। শান্তি কি এই নষ্ট পৃথিবীতে এতোই সুলভ যে চাইলেই আকাশ থেকে শ্রাবণের ধারার মতো ঝরবে? ১৪ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিরা খাগড়াছড়ির দুদকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারে ক'রে ঠিকই ঢাকায় আসেন, তাঁদের পরিচিত রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা 'পদ্মা'য় প্রবেশ করেন সাড়ে বারোটায়, সারেন রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্নভোজ; এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সাথে ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ শান্তি আলোচনা করেন দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। ওই দু-ঘণ্টায় কোনো শান্তি আসে নি; পত্রিকাগুলোর শান্তি আলোচনার বিবরণ থেকে ধারণা করতে পারি যে অতিথিশালা 'পদ্মা' ওই দু-ঘণ্টায় হয়ে উঠেছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামের মতোই অশান্তিপূর্ণ। সরকারি শান্তি আলোচকেরা জানান, 'রক্তধার সংলাপ চলছে, চলবে;' শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিরা তাঁদের রীতি অনুসারে কিছুই বলেন নি সাংবাদিকদের। এতে মনে হয় অশান্তি চলছে, চলবে। *বাংলাবাজার পত্রিকা* ১৮ জুলাই ১৯৯৭।

তারিখে জানিয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি আলোচনার খবর নেই'। চারদিন ধ'রে তাঁরা একটি কঠিন কাজ করেছেন— শান্তি আলোচনা করেছেন, কিন্তু শান্তির সূত্র বের করতে পারেন নি; বের করতে পারবেন কিনা তা কেউ জানে না। শান্তির সূত্র বৈজ্ঞানিক সূত্র নয় যে অঙ্ক ক'রে বা গবেষণাগারে তা পাওয়া যাবে; আবার তা এমন আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয় যে পাওয়া যাবে স্বপ্নে। এটা রাজনীতি, আর রাজনীতি সাধারণত অশান্তি পছন্দ করে। শান্তিবাহিনী এর মাঝে যোগ করেছে আরেক নতুন শর্ত, শান্তি আলোচনায় ভারতকেও চাচ্ছে। এটা একদিকে ভালো : ভারত চাইলে শান্তি আসতে দেরি হবে না; আরেক দিকে খারাপ : ভারত না চাইলে কখনো শান্তি আসবে না। সরকার এখনো ফিরিয়ে আনা শরণার্থীদেরই ঠিক মতো পুনর্বাসিত করতে পারে নি;— তাদের কাছে গেলে শোনা যায় তারা জমি ফিরে পায় নি, মুসলমান অভিভাবসীরা দখল ক'রে আছে তাদের জায়গা, তাদের থাকার জায়গা নেই, তাদের ভাঙা মন্দির তৈরি করা হয় নি, হাতির আক্রমণে বিপর্যস্ত তারা। এদিকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আর পাহাড়ি নারী পরিষদ যেমন তেমনি পাহাড়ি মুসলমান বা বাঙালিরা পেশি টানটান ক'রে অপেক্ষা করছে শান্তি বা অশান্তির। আমার রক্ত টের পাচ্ছে শান্তি নেই পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছড়িগুলো দিয়ে কি আরো বহু দিন বইতে থাকবে অশান্তি ঘৃণা বিদ্বেষের পথকিল ধারা?

রক্তাক্ত বিপন্ন পাহাড়

বাংলাদেশ খুবই ছোটো দেশ; কিন্তু ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের এলাকাকে, একভাবে, মনে হয় পৃথিবীর থেকেও বড়ো। চোখ বন্ধ করে তাকালে পৃথিবী মোটামুটি চোখে পড়ে; কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা চোখে পড়ে না। কতো দূর রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট? কতো দূর পার্বত্য চট্টগ্রাম? কোনোদিন নিউইয়র্ক যেতে পারি, যাওয়াটা অনেকেই প্রত্যাশা করে; কিন্তু কখনো হয়তো রাজ্যমাটি যাওয়া হবে না। মধ্যযুগীয় দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ছোটো দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল। এক এলাকার মানুষ মুখোমুখি হয় না আরেক এলাকার মানুষের; তাদের উৎসাহ নেই, উপায়ও নেই পরস্পরকে জানার। বাংলাদেশ শুধু বাঙালির নয়, আরো কয়েকটি জাতির এদেশ। একথাটি আমরা সব সময়ই ভুলে থাকি, উপেক্ষা করি অন্য জাতিদের। যাদের আমরা উপজাতি নাম দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি, জীবনের মূল স্রোতে ঢুকতে দিই নি, সে-সাঁওতাল, মগ, চাকমা প্রভৃতি জাতিও শতাব্দীপরম্পরায় বাংলাদেশের অধিবাসী; এটা তাদের আপন দেশ। ঢাকায় অবশ্য তাদের বিশেষ দেখা যায় না। সাঁওতাল ও মগদের শুধু ছবিতে দেখেছি; শুধু কিছু চাকমাকেই চোখে দেখেছি। তারা যেমন কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে, তেমনি তারা বাস করে আমাদের মনেরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রাষ্ট্রে তাদের বিশেষ অধিকার নেই। রাষ্ট্র তাদের কী দেয় জানি না, তবে এটা বুঝি রাষ্ট্র কাড়ে তাদের অনেক কিছু : কাড়ে তাদের আবেগ, কামনাবাসনা, জীবনপদ্ধতি, ও আরো বহু কিছু। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো উপজাতিদের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্যে কুখ্যাত। অনেক সভ্য জাতি আদিম অসভ্যদের হার মানিয়ে উৎখাত করেছে উপজাতিদের। বাংলাদেশেও কি তাই হচ্ছে? উপজাতিরা আমাদের দেশের এমন অধিবাসী, যাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি। আধুনিক সভ্যতাকে উপেক্ষা করে তারা চমৎকার জীবনযাপন করতে পারে; ওই জীবনকে সাজিয়ে রাখতে পারে বিচিত্র সাংস্কৃতিক কারুকাজে। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমানের জীবনে ওই সাংস্কৃতিক কারুকাজ নেই। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ নয়, এগুলো একরকম মুখোশ ও পণ্য; কিন্তু উপজাতিদের জীবনে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ রক্তপ্রবাহের মতো। এমন যারা, তাদের বিপন্ন রক্তাক্ত হাতে দেয়া যায় না।

চাকমারা বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু জাতি। তাদের জীবনপদ্ধতি ভিন্ন আমাদের থেকে। তাদের শারীরিক সৌন্দর্য চোখকে শোভায় ভরে দেয়। বহু দিন ধরেই ওই জীবন ও সৌন্দর্যের দিকে থাবা বিস্তার করে আছে তথাকথিত সভ্যতা ও রাষ্ট্র। কতো তরুণীর লাগণা যে নষ্ট হয়েছে সভ্য মানুষের আদিমতায়, তার হিশেব নেই। কোনোদিন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যাই নি (একেবারে যাই নি, তা নয়; বত্রিশ বছর আগে একবার রাজামাটি গিয়ে বৃষ্টিতে আটকে ছিলাম চারদিন, কিছুই দেখা হয় নি : সংযোজন), হয়তো যাওয়া হবেও না কোনো দিন। কিন্তু ওই অঞ্চলের কথা ভাবলে দেখতে পাই পাহাড়, বাঁশঝাড়, শাল-কড়ই-কমলালেবুর বন, বক্ষবাসহীন শুভ্র তরুণী, সরল শাস্ত্র পুরুষ, নৃত্যগীত, আর উৎসবে মদ্যপানের উল্লাস (এটা হয়তো রোম্যান্টিক কল্পনামাত্র, ওটি দুঃখের পাহাড়, ইয়েটসের বাইজেনটিয়াম নয় : সংযোজন)। ওই জীবন আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু ওই জীবনে সুখ পেতে আমার কোনো কষ্ট হতো না (এটা সত্যি কিনা জানি না : সংযোজন)। বর্বর আধুনিকতায় বাস করার থেকে ওই আদিম নৈসর্গিক জীবন মানুষকে অনেক বেশি পূর্ণতা দেয় (এটাও সত্যি কিনা জানি না : সংযোজন)। ওই জীবন কি এখন বিপন্ন, ওই মানুষেরা কি এখন রক্তাক্ত? পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় কি এখন রক্তের দাগে মলিন? কমলার হলুদ রঙের ওপর কি লাগছে রক্তের ছোপ? চারপাশে যা শুনি, তাতে এসব প্রশ্ন জাগে; অপরাধবোধে মন কালো হয়ে যায়।

খুব বড়ো করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় : পার্বত্য চট্টগ্রামে কী হচ্ছে? যা হচ্ছে দেশবাসীকে তা অকপটে জানানো উচিত। এ-ব্যাপারে গোপনীয়তা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তারা কি বিচ্ছিন্ন হতে চায়? কেনো হতে চায়? তাদের ক্ষোভের কারণ কী? কেনো তারা পরিতৃপ্ত থাকতে পারছে না বাংলাদেশে? এসব প্রশ্নের উত্তর জাতির কাছে পেশ করা দরকার। পত্রপত্রিকাগুলো থেকে বেশি কিছু জানা যায় না। এ-সম্বন্ধে তাই মানবিক বিবেকী মানুষের মনে গভীর সন্দেহ দেখা দেয়। এটা রাষ্ট্রের জন্যে মঙ্গলজনক নয়। চাকমাদের অসন্তোষের একটি বড়ো কারণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু মানুষকে তাদের এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এটা তাদের ওপর আশ্রাসন। এটা যদি তাদের স্বার্থ ও আবেগকে আঘাত করে থাকে, তাহলে বিষয়টি ভালোভাবে পুনর্বিবেচিত হতে পারে। এ-ধরনের পুনর্বাসন ঠিক নয়; তাতে মূল অধিবাসীদের মনে আক্রান্ত হওয়ার বোধই জেগে ওঠে; এবং পুনর্বাসিত ও আদি অধিবাসীদের মধ্যে চিরশত্রুতা সৃষ্টি হয়। পুনর্বাসিতরা রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেয়ে যথেষ্টাচার করে থাকে নিশ্চয়ই; এবং এর ফলে

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মনে রাষ্ট্র ও বাঙালিবিদ্বেষ জাগা স্বাভাবিক। চাকমারা এখন আর বাঙালিদের বন্ধু হিসেবে দেখে না, যেমন আমরা দেখি নি পাকিস্তানিদের। তাদের বুক ভঁরে আছে সন্দেহে। তারা হয়তো তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত। রাষ্ট্রকে এটা ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এটা জানা কথা সামরিক উপায়ে এ-সমস্যার সমাধান কঠিন। আমরা যারা আগ্রাসন ভোগ করেছি, তারা এমন আচরণ করতে পারি না, যাতে অন্যরা আমাদের ভাবতে পারে আগ্রাসী। ক্ষমা ঘোষণার কথা মাঝেমাঝে শুনতে পাই; এটা বেশ ভয় জাগায়; কারণ একান্তরে এমন ক্ষমার অনেক আশ্বাস পেয়েছি, ক্ষমা পাই নি। এমন ক্ষমার আশ্বাস বিশ্বাস সৃষ্টি করে না; বিদ্রোহকে তীব্র করে তোলে।

কিছুই ঠিক মতো জানি না বলে দুর্ভাবনাই জাগে বেশি; বিশেষ করে একান্তর পেরিয়ে এসেছি বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কি মানুষেরা সারাক্ষণ আতঙ্কে বাস করে? যে-কোনো সময় নিহত হওয়ার, গৃহহীন হওয়ার ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত? রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে কী ভূমিকা নিচ্ছে, সব মানুষকে কি শত্রু ও সন্দেহজনক বলে গণ্য করছে, যেমন পাকিস্তানিরা আমাদের গণ্য করতো একান্তরে? এ-বিষয়ে সত্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া দরকার; নইলে বিভিন্ন রটনাকেই মানুষ সত্য বলে ভাবতে থাকবে। যেমন আমার হাতে এসেছে 'বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্রপরিষদ'-এর একটি প্রচারপত্র। তাতে যে-সব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, তা মর্মান্তিকভাবে একান্তরের বাঙলার গ্রাম ও মাইলাইকে মনে করিয়ে দেয়। ৪-৫-৮৯ তারিখে লংগদু উপজেলায় কিছু লোক নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়; নিহত হয় পঁচিশজন, আহত হয় অনেক। ওই প্রচারপত্রে মুতাছড়ি, ফেনি, মাটিরাক্সা, পানছড়ি, ছোট হরিণা প্রভৃতি স্থানের এমন অনেক নৃশংস ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ-প্রচারপত্র যা বলছে, তা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে বাঙালি হিসেবে আমি নিজেকে অপরাধী গণ্য করি। এসব সংবাদ কোনো পত্রিকায় বেরোয় নি বলেই ভয় হয় এসব হয়তো সত্য। কিন্তু কেনো এমন হবে? রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনি এমন মানবিক উদ্যোগ নেয়া দরকার, যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়, এবং সবুজ পাহাড়ে, কমলালেবুর বনে শান্তি ফিরে আসে। কে না জানে বাঙলাদেশের মতো ছোটো দেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সুন্দর ভূভাগ হারাতে পারে না, আর পার্বত্য চট্টগ্রামও হারাতে পারে না বাঙলাদেশকে। বাঙলাদেশকে সব কিছু করতে হবে মানবিকভাবে : গোলাবারুদ থেকে বিনাশি শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে, কিন্তু প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটে না।

সাপ্তাহিক ধবরের কাগজ (১৯৮৯); নিবিড় নীলিমা (১৯৯২) থেকে সংকলিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম : তথ্য

অবস্থান	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। উত্তরে ও খাগড়াছড়ি জেলার পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড়পুঞ্জ ও মায়ানমার, দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা।
ভূপ্রকৃতি	বাংলাদেশের প্রধান পার্বত্যখণ্ড; সমতল ভূমির থেকে এর রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাহাড়পুঞ্জের মধ্যস্থলে রয়েছে উপত্যকা, যা অনেকটা সমতল; বনভূমিময়, এবং রয়েছে বরনাধারা, যেগুলোকে বলা হয় 'ছড়া' বা 'ছড়ি'।
আয়তন	আয়তন নিশ্চিতভাবে সম্ভবত কেউ জানে না; এক মতে ৫০৯৩ বর্গমাইল, আরেক মতে ৫১৩৮ বর্গমাইল বা ১৩০০০ বর্গ কিমি; মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের দশ ভাগের একভাগ।
পাহাড়পুঞ্জ	পাহাড়পুঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এগুলোকে দশটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় : সুবলং, মায়ানি, কাসালং, সাজেক, হরিং, বরকল, রাইনখিয়াং, চিবুক, মিরিঞ্জা। পাহাড়গুলো সাধারণত ১০০ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু; সবচেয়ে উঁচু চুড়ো কেওক্লাডং (২৯৬০ ফুট)।
নদনদী	প্রধান নদী সাতটি : চেংগি, মায়ানি, কাসালং, কর্ণকুলি, রাইনখিয়াং, সাংগু, মাতামুহুরি।
হ্রদ	প্রধান হ্রদ কাগুই; এটি কৃত্রিম হ্রদ, যার আয়তন ২৬৫ বর্গমাইল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে কর্ণকুলি নদীতে বাধ (দৈর্ঘ্য ১৮০০ ফুট, উচ্চতা ১৫৩ ফুট) দেয়ার ফলে এটি সৃষ্টি হয়। এ হ্রদের জলে ডুবে যায় পুরোনো রাসামাটি শহর, তাই নির্মিত হয় নতুন রাসামাটি শহর। এ ছাড়া আছে দুটি প্রাকৃতিক হ্রদ : রাইনখিয়ানকাইন ও বোগাকাইন।
জেলা	জেলা তিনটি : খাগড়াছড়ি, রাসামাটি, ও বান্দরবান।
থানা	তিন জেলার থানা আছে ২৫টি। খাগড়াছড়িতে ৮টি : খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘিনালা, মাটিরাসা, রামগড়, মাণিকছড়ি, মহলছড়ি, লক্ষীছড়ি। রাসামাটিতে ১০টি : রাসামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগুদু, বরকল, নানিয়ারছড়, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাগুই, রাজহলি, বিলাইছড়ি। বান্দরবানে ৭টি : বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম, নাইকংছড়ি।
জনসংখ্যা	পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট লোকসংখ্যা ৯৭৪৪৪৫; উপজাতীর ৬৬৩০৭৭, আর

বাঙালি ৩১১৩৬৮জন। চাকমা ৩০৬৬১৬, মারমা (মগ) ১৭৬২৩০, ত্রিপুরা ১০২৪৫৫, মুরং ৩২০৯৮, তঞ্চঙ্গ্যা ২১১৪০, বৌম ৫৫৮৪, পাংখু ১৬৬৮, খুমি ১০৯১, উসাই ৯৬৬, থিয়াং ১৩২৮, ছক ৭৯৮, লুসাই ৬৬৯, রিয়াং ২৪৩৪জন। শতকরা হিসেবে ৩০.৫৭% চাকমা, ১৬.৬০% মারমা, ৭.৩৯% ত্রিপুরা, অন্যান্য উপজাতি ৬.০৬% আর বাঙালি ৩৯.৩৮%। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ০.৫% জন বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। ১৯৭৯তে সুপরিষ্কৃত অভিবাসনের ফলে হঠাৎ প্রবলভাবে বেড়েছে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা; তারা টিকে থাকলে করেক দশকে পাহাড় হয়ে উঠবে বাঙালি মুসলমানের।

উপজাতিগণ	১৩টি উপজাতি : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা, বৌম, পাংখু, খুমি, উসাই, থিয়াং, ছক, লুসাই, রিয়াং।
চাষবাস	পাহাড়ে জুমপদ্ধতিতে, উপত্যকায় কৃষিপদ্ধতিতে। জুমই চাষের প্রধান পদ্ধতি। পাহাড় পুড়িয়ে তগল বা দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে একই গর্তে বোনা হয় ধান, কার্পাস, ভুট্টা, শশা প্রভৃতির বীজ। সমতলভূমিতে উৎপাদন করা হয় ধান, সরষে, তামাক, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি।
নৃত্য	তারা তিব্বতি-বর্মি মঙ্গোলীয় গোত্রের। আকারে খাটো, চুল কালো, চোখ সরু, আর কপালের অস্থি উচ্চ।
উৎস	পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল আদিবাসী কুকিরা; আরাকানি চাকমাদের আগ্রাসনে কুকিরা বিতাড়িত হয়, এবং চাকমারা চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে বসতি স্থাপন করে। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় মগরা আরাকান থেকে বিতাড়িত করে চাকমাদের, তারা দলেদলে ঢেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও বসতি স্থাপন করে। জাতি হিসেবে তারা বিন্যস্ত হয় তিন ভাগে : চাকমা, মারমা (মগ), তঞ্চঙ্গ্যারা আরাকানি; ত্রিপুরা (টিপরা), রিয়াং, শ্রোংরা ত্রিপুরী; পাংখু, বন, চক, খুমিয়া, শ্রোং, কিয়াংরা কুকি।
ধর্ম	চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমারা বৌদ্ধ, ত্রিপুরারা হিন্দু, লুসাইরা খ্রিস্টান; শ্রোং, রিয়াং, খুমি, শ্রোং, বনজোগী, পাংখোরা সর্বান্ধাবাদী।
ভাষা	প্রত্যেক উপজাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা; নিজেদের মধ্যে তাঁরা নিজেদের ভাষায় কথা বলেন; তবে ভিন্ন উপজাতির সাথে কথা বলেন বাঙলায়।
সংস্কৃতি	চাকমা ও মগদের প্রধান বার্ষিক উৎসব মহামণিমেলা অনুষ্ঠিত হয় বাঙলা বর্ষের শেষে। পুরুষরা ধৃতি ও জামা পরে, মাথায় পরে 'খবং'; নারীরা নিম্নাঙ্গে পরে 'পিন্দম', বকে 'খাদি'; তারা শাড়ি-রাউজও পরে। নারীরা উৎকৃষ্ট বুনশিল্পী; তারা বোনে কারুকাঙ্কিত বস্ত্র, যার নাম 'আলম'। বাঁশের বাঁশি তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র, যাতে তারা তোলে প্রেমাবেগের কাতরতা। তাদের প্রিয় ও প্রধান মহাকাব্যের বিষয় রাধামোহন ও ধনপতির বিরহবিধুর প্রেম।
সমাজপদ্ধতি	তাদের প্রধান বা সমাজপতি তিন রাজা : চাকমা, মৌং, ও বোমং রাজা। রাজারা নিজ নিজ সার্কেল বা এলাকার প্রধান, সমাজ শাসনের ও কর

আদায়ের দায়িত্ব তাদের। বর আদায়ের জন্যে নিযুক্ত হতো দেওয়ানরা, যারা ছিলো খুবই শক্তিশালী। ১৯০০ সালে দেওয়ান পদটি লুপ্ত হয়। প্রত্যেক রাজার নিজস্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি আছে; তবে উপজাতিদের আর কারো জমির মালিকানা নেই। শাসনের জন্যে প্রতিটি মৌজার জন্যে আছে একজন ক'রে 'হেডম্যান', আর পাড়া/গ্রামের জন্যে 'কারবারি'। তারা অনেকটা পাহাড়ি যাযাবর; হেডম্যান বা কারবারির অনুমতি নিয়ে তারা বিশেষ পাহাড়ে বা ভূমিতে থাকতে ও চাষ করতে পারে, কিন্তু ওই ভূমির তারা মালিক নয়। এক অর্থে তারা চিরউষা। চাকমাদের বিচারপদ্ধতিকে বলা হয় 'লাজের বাহার'। প্রতিটি উপজাতি বিভক্ত কয়েকটি গোত্রে; যেমন শ্রোংদের আছে পাঁচটি গোত্র, মগদের একুশটি, চাকমাদের চব্বিশটি। তাদের সমাজ পিতৃপ্রধান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম : কালপঞ্জি

- ১৪১৮ চাকমা রাজা মোআন তসুনি ব্রহ্মদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নেয় রাঙ্গু ও টেকনাফে।
- ১৬৬৬ মুঘলবিজয়; আরাকানরাজের অধিকার থেকে এটি আসে আওরঙ্গজেবের অধিকারে; মুঘলদের অধীনে থাকে ১৭৬০ পর্যন্ত।
- ১৭৬০ মীর কাসেম আলি খানের থেকে অধিকার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। চাকমারা প্রথম এটি মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ করে।
- ১৭৭৭ ইংরেজের বিরুদ্ধে কুকিদের বিদ্রোহ।
- ১৮৬০ চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা; ভাগ করা হয় চাকমা, মোং ও বোমং-এ-তিনটি সার্কেল বা ভাগে। শাসনের জন্যে নিয়োগ করা হয় তত্ত্বাবধায়ক।
- ১৮৬৩ নির্দিষ্ট হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমা।
- ১৯০০ হিল ট্র্যাংস ম্যানুয়েল বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিমালা; এটি তাঁদের খুব প্রিয়, যদিও এটি সাধারণ পাহাড়িদের বিশেষ অধিকার দেয় নি, অধিকার দিয়েছে শুধু তাঁদের প্রভুদের। এ-বিধি অনুসারে জেলাপ্রশাসকই হয়ে ওঠে বিধাতা। এর কয়েকটি প্রধান বিধান হচ্ছে : (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি 'এক্সক্লুডেড বা ননরেগুলেটেড এরিয়া' বা 'অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ এলাকা', যেখানে জেলাপ্রশাসকের অনুমতি ছাড়া বাইরের কেউ যেতে বা বসতি স্থাপন করতে পারবে না; (খ) উপজাতীয়রা পঁচিশ বিঘা জমি ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু মালিক হ'তে পারবে না; (গ) বিচারালয়ে কোনো উকিল থাকবে না; (ঘ) রাজা, হেডম্যান, কারবারিরা থাকবে; (ঙ) দরকার হ'লে বিনাপারিশ্রমিকে উপজাতীয়রা সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ ক'রে দিতে বাধ্য থাকবে; (চ) রাজা, হেডম্যান, কারবারিরাও উপজাতীয়দের বিনাপারিশ্রমিকে ষাটাত্তে পারবে। এ-বিধি উপজাতীয়দের দাসে পরিণত করে, কিন্তু সমাজের সমস্ত প্রভুদের উপকারে আসে বলে এটিকে তারা খুব ভালোবাসে। এটিতে বলা হয় যে তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া হলো; কিন্তু আসলে কিছুই দেয়া হয় নি; কেননা অর্থের ব্যাপারটি থাকে ব্রিটিশের হাতে। ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্যে ব্রিটিশ হাতি চলার উপযুক্ত সস্ত্র সস্ত্র পথ তৈরি করে, আর ন-মাইল পরপর স্থাপন করে বিশ্রামাগার-কেননা হাতি একদিনে ন-মাইল হাঁটেতে পারে। ব্রিটিশপূর্বে উচবিত চামকরা ব্রিটিশের কাছ

থেকে নানা সুবিধা নেয়; এমনকি রাজপরিবার ও বিলেতিদের মধ্যে দুটি বিয়েও ঘটে।

- ১৯১৬ কমিনীমোহন দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি।
- ১৯২০ এক্সক্লুসিভ এরিরা বা একান্ত এলাকা ঘোষণা।
- ১৯৫৪ পাহাড়ি ছাত্র সমিতি গঠিত।
- ১৯৪৭ কমিনীমোহন দেওয়ান ও মেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি দল (জনসমিতির প্রতিনিধি), এবং ভুবনমোহন রায়ের নেতৃত্বে আরেকটি দল (পার্বত্য রাজাদের প্রতিনিধি) দিল্লি গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন; এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন করেন। র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে।
- তারা পাকিস্তান যেনে নেন না। ১৪ই আগস্টের পর রাস্তামাটিতে চাকমারা উড়োন ভারতীয় পতাকা, বান্দরবানে মারমারা উড়োন ব্রহ্ম পতাকা। বেঙ্গল বাহিনী তাঁদের দমন করে।
- ১৯৬০ কাগাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র; কাগাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে গিয়ে ডুবে যায় বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি এবং বাড়িঘর; ৫৪,০০০ একর বা ৩৫০ বর্গমাইল উর্বর জমি হারিয়ে যায় কৃষিমহুদের তলে, এবং ১০০,০০০ পাহাড়ি পরিণত হন উদ্ধারহীন।
- ১৯৬২ উপজাতীয় এলাকা ঘোষণা।
- ১৯৬৪ উপজাতীয় এলাকার মর্যাদা লোপ ক'রে আবার ১৯০০ সালের বিধিমালা গ্রহণ।
- ১৯৬৬ মানবেন্দ্র নারায়ণ শারমা ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থাপন করেন উপজাতীয় ছাত্র সমিতি।
- ১৯৬৯ উপজাতীয় ছাত্র সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় রাস্তামাটিতে। এটি মার্ক্সবাদী-মাওবাদী সংগঠন।
- ১৯৭০ রাস্তামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টি; এর সশস্ত্র বাহিনীর নাম গণমুক্তি কৌজ।
- ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ; মুক্তিযুদ্ধে অনেক পাহাড়ি তরুণ অংশ নেয়, তবে চাকমা ও মারমা রাজারা সমর্থন করে পাকিস্তানকে; এবং পাহাড়িরা থাকেন সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনী কঠোর প্রতিশোধ নেয়। তাই তারা উদ্ভাসের সাথে স্বাগত জানাতে পারেন নি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে।
- ১৯৭২ ২৯ জানুয়ারি : স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে চাকমিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একদল উপজাতীয় প্রতিনিধি মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে হতাশ হন।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাজা মং প্র সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল মুজিবের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন; তাঁদের দাবিগুলো রেখে যান।
- মার্চ : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত : এটি রাস্তামাটি কম্যুনিষ্ট

সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার স্বরনাথারা

পার্টির বাহ্যিক রূপ। সদস্য : বি কে রোয়াজা, মানবেন্দ্র নারায়ণ, মেহকুমার চাকমা। স্বাধীন চাকমাজুমির জন্যে প্রচার।

২৪ এপ্রিল : মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ ওই দাবিগুলো আরো বিস্তৃতভাবে পেশ করেন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণেতাদের কাছে।

শ্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্রসমিতির পুনরুজ্জীবন।

১৯৭৩

খাগড়াছড়ির ইটছড়ির জঙ্গলে শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠিত।

এর নাম রাখা হয় মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় নারায়ণ ডাকনাম শঙ্কু বা শান্তি অনুসারে।

আওয়ামি লিগ প্রার্থীকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শান্তিবাহিনীর জন্যে সদস্যসংগ্রহ শুরু।

১৯৭৪

মানবেন্দ্র নারায়ণ বাকসালে যোগদান।

শান্তিবাহিনীর ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা; কিন্তু ভারত তা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকারকে।

১৯৭৫

শান্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে।

মুজিবহত্যার; মানবেন্দ্র নারায়ণ আত্মগোপন ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু।

সমস্যা সমাধানের জন্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ।

নভেম্বর : ভারত মানবেন্দ্র নারায়ণকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়, সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করতে বলে।

১৯৭৬

শান্তিবাহিনীর প্রথম আক্রমণ; তারা আক্রমণ চালায় একদল পুলিশের ওপর।

সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন শঙ্কু নারায়ণ ও চবরি নারায়ণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত; বোর্ডের প্রধান চট্টগ্রামের জিওসি।

১৯৭৬-৮০

শান্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের কাল।

১৯৭৯

বিপুল পরিমাণ বাঙালি মুসলমানের সুপরিচালিত অভিবাসন।

১৯৮১

শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার জন্যে শঙ্কু নারায়ণ ও চবরি নারায়ণকে মুক্তি দান।

৩০ মে : জিয়াহত্যা; শঙ্কু নারায়ণ আত্মগোপন।

১৯৮১-৮৩

শান্তিবাহিনীর নারায়ণবাহিনী ও শ্রীতিবাহিনীর মধ্যে তীব্র অন্তর্কলহ।

জুন : নারায়ণবাহিনীর হাতে শ্রীতিবাহিনীর অস্ত্রগুরু অমৃতলাল চাকমা নিহত।

ডিসেম্বর : শ্রীতিবাহিনীর হাতে মানবেন্দ্র নারায়ণ নারায়ণ নিহত।

১৯৮৩-৮৫

সরকার কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

১৯৮৫

সরকার ও শ্রীতিবাহিনীর মধ্যে আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের চুক্তি; তবে

ঐতিহ্যমূলক আত্মসমর্পণ করেন নি।

- ১৯৮৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ভাগ করা হয় তিনটি জেলায় : উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা, মাঝখানে রাঙ্গামাটি জেলা, এবং দক্ষিণে বান্দরবান জেলা।
- ১৯৮৫ এপ্রিল : ঐতিহ্যবাহিনীর সাথে শান্তি আলোচনা ও নিষ্ফল চুক্তি।
২১ অক্টোবর : শত্রুবাহিনীর সাথে নিষ্ফল শান্তি আলোচনা।
- ১৯৮৬ শান্তিবাহিনীর প্রচণ্ড হিংসাত্মক কার্যক্রম; ক্রিশ্চিয়ান বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয়গ্রহণ।
- ১৯৮৭-৮৮ শত্রুবাহিনীর সাথে নিষ্ফল শান্তি আলোচনা।
- ১৯৮৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ।
- ১৯৯২ শান্তিবাহিনী কর্তৃক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। এ-পর্বত তারা ৩৪বার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে, এবং লংঘন করেছে অজস্রবার। শেষ ঘোষণায় বিরতির সীমা বাড়িয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত।
- ১৯৯২-৯৫ শত্রু লারমার শান্তিবাহিনীর সাথে বহুবার শান্তি আলোচনা।
- ১৯৯৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি ও শত্রু লারমার বাহিনীর মধ্যে শান্তি আলোচনা-নিষ্ফল।
- ১৯৯৭ ১৪ মে : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি ও শত্রু লারমার বাহিনীর মধ্যে শান্তি আলোচনা।
- ১৪ জুলাই : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি ও শত্রু লারমার বাহিনীর মধ্যে কয়েক দিন ধরে নিষ্ফল আলোচনা। শান্তিবাহিনী একটি মতুন শর্ত ও সমস্যা যোগ করে; তারা ভারতকেও আলোচনায় অর্ন্তভুক্ত করার দাবি করে। এ-দাবির জটিলতা এতো সুদূরপ্রসারী যে শান্তি হয়তো সুদূরবর্তী।



হুমায়ুন আজাদ এক দশক আগে 'রক্তাক্ত বিপ্লব পাহাড়' নামে লিখেছিলেন একটি আবেগভারাত্মক রচনা পাহাড়িদের পক্ষে; সশ্রুতি তিনি দেখে এসেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনি যুদ্ধ হয়েছেন পাহাড়ের সৌন্দর্যে, যা এ-রচনা শুঁরেই মিলবে; তবে তিনি শুধু সৌন্দর্যেই ডুবে থাকেন নি; বুঝতে চেয়েছেন উপজাতীয়দের অবস্থা, সমাজ, রাজনীতি, ও তাঁদের বিদ্রোহের প্রকৃতি। তারই কল *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ররনাধারা*। বিন্যাস উৎপাদনের জন্যে যখন তৈরি হয়েছিলো কাণ্ডাই-ফুদ, উপজাতীয়রা বলেছিলেন, ওই তারের ভেতর দিয়ে শুধু বিন্যাস বয় না, দুঃখের দীর্ঘশ্বাসও বয়ে চলে। হুমায়ুন আজাদ এ-বইতে তাঁদের দুঃখবেদনার পরিচয় দিয়েছেন, তুলে ধরেছেন তাঁদের বিদ্রোহের পটভূমি; তবে তিনি মেনে নিতে পারেন নি উপজাতীয় সমাজকাঠামো। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের অভাব নয়; প্রধান সমস্যা হচ্ছে ওই অঞ্চলের সামন্ত প্রভুরা সাধারণ মানুষদের বিকশিত হ'তে দেয় নি, তাঁদের দাসে পরিণত ক'রে রেখেছে ১৯০০ সালের বিধিমালা দিয়ে। বাংলাদেশের দায়িত্ব হচ্ছে পাহাড়ি জনগণকে আধুনিক গণতান্ত্রিক অধিকারসম্পন্ন সচ্ছল শিক্ষিত মানুষে পরিণত করা; এবং তাদের দ্রুত সার্বিক উন্নতি সাধন। তাঁদের আদিম সামন্ত সমাজকাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষের কোনো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই; তাই ওই সামন্ত সমাজকাঠামো ভাঙা দরকার। শান্তিহীন পৃথিবী এখন অজস্র শান্তিচুক্তির ভূপে ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু শান্তির আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। চুক্তিবদ্ধ শান্তি বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার; শান্তি স্থাপনের কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র নেই, এবং কোনো যাদুও নেই। চুক্তি ক'রে নয়, পাহাড়িদের অবস্থার উন্নতি ক'রেই শুধু সেখানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব শান্তি।

